একজন মুক্তিযোদ্ধার ভাবনা

আবদুল মননান

সূচীপত্র

১)   স্মৃতিতে আজও অম্লান ৫-
২)   সময়ের বিবর্তন ও রাজনৈতিক প্রত্যাশা ৮-
৩)   আমি আমার মন ও আত্মসমালোচনা
৪)   ইসলামী দর্শন এবং কলেমার প্রয়োজনীয়তা
৫)   পাকিস্তানী দুঃশাসন থেকে আজ মুক্ত
৬)   আরজ আলী মাতুব্বর ঃ এক অপ্রকাশিত অধ্যায়
৭)   আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র
৮)   একজন সমাজসেবী ও দানবীর অমৃত লাল দে
৯)   চরবাড়িয়া গণকবর শুভ উদ্বোধন
১০) মায়ের প্রতি আরজের ভালবাসা গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব
১১) শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রহমান খান
১২) অতীশ দীপঙ্কর গবেষণা পরিষদ কর্তৃক আলোচনা সভায় বক্তব্য
১৩) প্রিয়ার দেয়া ফতুয়া
১৪) উদ্বাবণী কার্যক্রম
১৫) অসীম সাহসী দেশপ্রেমিক এক বীরোত্তমের কথা
১৬) ২৫ এপ্রিল নারকীয় হতাযজ্ঞের দিন
১৭) সত্যেও সন্ধানে এক সাহসী সৈনিক আরজ আলী মাতুব্বর
১৮) একাত্তরের রক্তাক্ত চরবাড়িয়া গ্রন্থের সমালোচনা লিখেছেন সাংবাদিক মাহমুদ মেনন
১৯) মায়ের প্রতি আরেজের ভালোবাসা
২০) শহীদ আবদুর রহমান খান স্মৃতি পাঠাগার

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তক

১) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থ "একাত্তরের রক্তাক্ত চরবাড়িয়া"-১৯৯৮।
২) অমর একুশ বইমেলা-২০০৬ সনে অমর প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ "জীবন থেকে পাওয়া"।
৩) অমর একুশ বইমেলা-২০০৯ সনে অমর প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত উপন্যাস "রূপসার প্রেম"।
৪) অমর একুশ বইমেলা-২০১৬ সনে অমর প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধ "মায়ের প্রতি আরজের ভালোবাসা"।
৫) লেখকের জীবনালেখ্য "প্রচেষ্টা" -২০১৮ খ্রিঃ।
৬) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থ 'চরবাড়িয়া গণহত্যা'-২০১৯ খ্রিঃ।
৭) সৌদি আরব এবং সেন্টমার্টিন ভ্রমন-২০২০ খ্রিঃ ।
৮) একজন মুক্তিযোদ্ধার ভাবনা - ২০২১ খ্রিঃ।

আমার ভাবনা

সরকারি চাকুরিজীবী। অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। নিয়মিত পত্রিকা পড়ার অভ্যেস। মাঝে মাঝে লেখতে ইচ্ছে হয়। মনে বিভিন্ন ভাবনা জাগে, প্রশ্ন জাগে। অনেক কিছুর উত্তর খুঁজে পাইনি। জানতে ইচ্ছে হয়। এহেন ভাবনা থেকে সুযোগ পেলে কিছু লেখার চেষ্টা।

খুলনা ১০ বছর চাকুরির পর বরিশাল বদলি হয়ে আসা। বরিশাল এসে দৈনিক আজকের পরিবর্তন পত্রিকার বার্তা সম্পাদক খন্দকার স্বপন ভাইয়ের সাথে পরিচয়। ফিচার লেখায় উদ্বুদ্ধ করেছেন তিনি। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। তিনি দৈনিক আজকের পরিবর্তন পত্রিকায় কর্মরত থাকাকালীন সময় অনেকগুলো ফিচার প্রকাশিত হয়েছে।

ফিচারগুলো সংরক্ষণ না করায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অনেক কষ্টে খুঁজে পাওয়া গেল। সংরক্ষণের জন্য একীভূত করা হলো। ইতোমধ্যে আমার লেখা কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তাই 'একজন মুক্তিযোদ্ধার ভাবনা' নামে প্রকাশ করা হলো।

আমার জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী, সমাজকল্যাণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে বহুমূখী কার্যক্রমমূলক সংগঠন "শহীদ আবদুর রহমান খান স্মৃতি পাঠাগার" প্রতিষ্ঠা করি। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-২) এর আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে উদ্ভাবনী অনুদান (Innovation Grants) কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র ভাসমান জেলেদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে **"ভাসমান জেলেদের শিশু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকল্প"** এর Project profile (পি. পি) দাখিল করি। সরকারের অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটি **সাফল্যজনক ভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে। সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।**

এ প্রকল্পের শিশুদের নিয়ে প্রচ্ছদ প্রস্তুত করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধ, দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর, পাঠাগার, লেখা-লেখি বিষয়ে আমার ভাবনাগুলো পড়ে যদি কেউ সামান্য উপকৃত হয় তা হলেই আমার লেখার স্বার্থকতা আসবে।

খোদা হাফেজ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মন্নান
০১৭১৫-৩৮০৩১৬

স্মৃতিতে আজও অম্লান

তৎকালীন পাকিস্তানী শাসনগোষ্ঠী ক্ষমতার দম্ভে একটি সর্বজন স্বীকৃত গণতান্ত্রিক রায়কে অগ্রাহ্য করে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে সুপরিকল্পিতভাবে গণহত্যায় লিপ্ত হয়। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। আমরা দেখতে পাই। পাকিস্তান আমলে বলগাহীন শোষণ ও বঞ্চণার বিরুদ্ধে এই গাংগেয় ব-দ্বীপ এলাকার জনগোষ্ঠী বারবার হয়েছে প্রতিবাদ মুখর। দিয়েছে বুকের তাজা রক্ত।

একাত্তরের ২৫ এপ্রিল এ দিনটির কথা ভাবতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। প্রতি বছর এপ্রিল মাস আসে। আর মনে পড়ে সেই ভয়াল বিভীষিকাময় দিনটির কথা। বরিশালের দখলে পাকবাহিনীর বর্বর হামলায় সেদিন একজন প্রত্যক্ষদর্শী। সেদিন জীবনটা যেতেও রয়ে গেছে কোন রকমের। ভাবতে অবাক লাগে আমি বেঁচে থাকব, বেঁচে আছি। এখনও মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না। একী সত্যি, স্বপ্ন, না কোন ঘোরের মধ্যে সে সময়টা কাটিয়েছি।

২৫ মার্চের পর হতে ঢাকা থেকে মানুষ ছুটে গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে। কিছু পথে হেঁটে কিছু পথ নৌকায় । তালতলী বাজারে নামে হাজারও মানুষের ঢল। মেজর জলিলের নেতৃত্বে বরিশালে মুক্তিবাহিনী সংঘটিত হয়। মহাবাজ উচ্চ বিদ্যালয় চালু করা হয় মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প। পাকবাহিনী বরিশালে আক্রমন করেছে এ গুজব শুনে এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হতে থাকে। বিশেষ করে নদীর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে। প্রতিটি বাড়িতে ট্রেন্স খনন করা হয়। ১৮ ও ২০ এপ্রিল জঙ্গি বিমান শহরে রকেট ও মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করে। এলাকার প্রায় সকল পরিবারের ছেলে-মেয়েসহ মহিলা সদস্যরা তাদের দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। আমাদের বাড়ির সকল মহিলা ও শিশুরা ২৪ তারিখের মধ্যে হেসামদ্দি ফুফা বাড়ি চলে যায়। আমি ২৫ এপ্রিল বাবাকে রেখে আমার বড় ফুফু, ফুফাতো ভাই-বোনদেরসহ নৌকায় হেসামদ্দি রওয়ানা হই। নৌকা ছাড়ার পর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা ঝুনাহারের কাছাকাছি আসতেই পাক বাহিনীর গানবোটগুলো দেখতে পাই। গানবোটগুলোর সামনে দিয়ে আমরা নদী অতিক্রম করছিলাম। গানবোটগুলো আস্তে আস্তে ঝুনাহার নদী দিয়ে শায়েস্তাবাদ চরবাড়িয়া অতিক্রম করছিল। ঠিক এমনি সময় ঝুনাহারের দু'তীরে রক্ষিত ইরানী ও মাঝমী স্টীমারে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাগণ গুলি ছুঁড়লে মুহূর্তের মধ্যেই গানবোট থেকে প্রচন্ড শব্দে গুলি এবং সেল নিক্ষেপ করতে থাকে। চর্তুদিকে শুধু গগন বিদায়ী টর-টর-টর শব্দ আর মাঝে মধ্যে সে শব্দ ছাপিয়ে গুর-গুর-গুরুম শব্দ। নদীর পানিসহ নৌকা কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। আমরা মঝাখানে পড়ে মনে হচ্ছিল গোলা এই বুঝি নৌকার উপর পরে আমরা সবাই মুহুর্তেই মারা যাব। নৌকার মধ্যে অবস্থানরত মহিলা ও শিশুরা চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করে। এই অবস্থায় প্রথমে আমি ও নৌকার মাঝি ঘাবরিয়ে হতভম্ব হয়ে পড়ি। কি করা দরকার, কি করব। হঠাৎ নৌকায় দাঁড় বৈঠা দেখে বৈঠাখানা লাগিয়ে দাঁড়টানা শুরু করলাম। দ্রুত উত্তর দিকের নদীতে চলে গেলাম।

এক সময় দেখলাম আমরা ভাষানচরের কাছাকাছি এসে গেছি। তখন তীরে উঠে হেঁটে আবার কিছু পথ দৌঁড়ে ফুফা আবদুর রব খানের বাড়ি গিয়ে পৌছি। মাকে জানালাম,আমরা এসেছি বাবা বাড়িতে আছেন।

এদিকে বাঁধা প্রাপ্ত পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকায় যোগাযোগ করে। দু'টি হেলিকপ্টার আধা ঘন্টার মধ্যেই জঙ্গি বিমানের প্রহরায় তালতলীর পূর্ব পাশের ত্রিফল আচ্ছাদিত মাঠে ছত্রী সৈন্য নামায়। জল, স্থল ও বোমারু বিমান নিয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা শক্তি বৃদ্ধি করে তিনটি গানবোট নিয়ে আক্রমন শুরু করে। সারা দিন প্রচন্ড গুলি বর্ষণ করে এলাকায় ভীষণ ভীতির সঞ্চয় করে। সামনে যাকে যে অবস্থায় পায় তাকেই গুলি করে হত্যা করে। বসত ঘর-বাড়ি, খড়ের কুঁড়ে আগুন লাগিয়ে দিলে আগুনের লেলিহান শিখায় আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমরা হেসামদ্দি থেকে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া দেখতে পাই। এই প্রলঙ্করী হত্যাযজ্ঞ যা চোখে না দেখলে অনুধাবন করা যায় না।

পরের দিন চর কমিশনার হয়ে মীরগঞ্জ দিয়ে নদী পার হয়ে হেঁটে চাঁদপাশা দিকে আসতে থাকলে পথে হাজার হাজার নারী-পুরুষের সাথে দেখা হয়। কতিপয় পরিচিতদের সাথে দেখা হলে তারা কি যেন বলতে গিয়েও আবার বলেনি। তখন মনে বহু প্রশ্ন দেখা দেয় এবং মনটিও খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। হঠাৎ করে আমার সেজো চাচা আবুল হাশেম খানের সাথে দেখা হলে সে আর আমাকে বাড়িতে আসতে না দিয়ে তার সাথে করে হেসামদ্দি দিকে চলে আসে। তাকে খুব বিমূর্ষ অবস্থায় দেখা গেল। মাঝ পথে এসে শুনতে পারলাম আমার বাবা ও দাদাসহ বহু লোক পাকবাহিনীর গুলিতে শাহাদৎ বরণ করেছে। খবরটি শুনে শিহরিয়া উঠলেও আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হলো না। সন্ধ্যার দিকে হেসামদ্দি পৌছলাম। আমি বাড়ি না গিয়ে নদীর তীরে বসে ভাবতে থাকলাম। কি হলো, কি হবে এ কিসের যুদ্ধ আর কবে আমরা স্বাধীন হবো। পশ্চিম পাকিস্তানীরা আর আমাদের শোষন করতে পারবে না ইত্যাদি। আরো ভাবলাম বাবার সাথে বাড়ি থাকলে আমাকেও হয়তো শাহাদৎ বরণ করতে হতো।

এদিনে চরবাড়িয়া ইউনিয়নের ৯০ বছরের বৃদ্ধা, ৮ মাসের কোলের শিশু, গর্ভবতী মহিলাসহ মোট ৪৭ জন শহীদ হন। নারী-পুরুষ, শিশুসহ আহত হন ২৫ জন। ৬৬ খানা বসতবাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। কয়েকটি গুরু মারা

যায়। কয়েকটি গরু-ছাগল খুঁজে পাওয়া যায়নি। খড়ের কুঁড় কতগুলো জ্বালিয়েছে তার হিসেব নেই। হানাদার বাহিনী সারা দিন হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে রাতে এ নদীতে নোঙ্গর করে ছিল। কয়েকজন নারী গুলিবিদ্ধ স্বামীকে বাঁচাতে পাক সেনাদের পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছে কিন্তু লোকলজ্জার কারণে আজও মুখ খোলেনি তারা।

দীর্ঘ ৩৭ বছর অতিবাহিত হলেও চরবাড়িয়া গ্রামে অবহেলায় পড়ে থাকা শহীদদের কবরগুলো সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা আজও করা হয়নি। পাকবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধের রণাঙ্গণ তালতলী নদীটি । এ যুদ্ধে ইরানী ও মাজভী নামে ২টি বিরাট স্টীমার ডুবে যায়। যেখানে বরিশালের মুক্তিযুদ্ধে রণাঙ্গণের স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি রক্ষা করার জন্য এলাকাবাসীদের বহুদিনের দাবি। এ স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য অবৈধ লৌহ ব্যবসায়ীরা ড্রেজার মেশিন দিয়ে স্টীমার কেটে তুলে নিয়েছে। বরিশালের গর্ব ও এ এলাকার একমাত্র রণাঙ্গণের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মানের জন্য মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের উদগ্র বাসনায় দেশ প্রেমে উজ্জীবিত লাখ লাখ মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদদের এক সাগর রক্তের বিনিময় সেদিন স্বাধীনতা সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিল। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যূদয় হয়েছিল। তাই মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের পরিবারের প্রত্যাশা- বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্য রচিত হোক এক নতুন পৃথিবী। যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্ব আর অজ্ঞানতার অভিশাপ থেকে মুক্তি। এই পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত হোক ১৪ কোটি বীর বাঙালী ভাই-বোনের সম্মিলিত মনোবল ও অসীম শক্তি। যারা রক্ত দিয়ে উর্বর করেছে বাংলাদেশের মাটি, সেখানে গড়ে উঠুক নতুন গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। গণমানুষের কল্যাণে সাম্য আর সুবিচারের মাটি থেকে গড়ে উঠুক নতুন দূর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা। সুবিচারের ভিত্তি প্রস্তরে লেখা হোক স্বাধীন বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস।

দৈনিক আজকের পরিবর্তন- ২৫ এপ্রিল ২০০৭ খ্রীঃ

সময়ের বির্বতন এবং রাজনৈতিক প্রত্যাশা

পরিবর্তন হলো ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট। পৃথিবীর কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। শ্বাশত বলে কোন জিনিস বিশ্বে নেই। অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানেও তা সত্য। বিজ্ঞানেরও সত্য। পিতা-মাতা,পুত্র-কন্যা, ভাই-বোনের সম্পর্ক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, সামাজিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সব কিছুই পরিবর্তনশীল। সমাজ জীবনে এই যে পরিবর্তন ঘটে তা কখনো খুব ধীরে ধীরে। কখনো খুব দ্রুত হয়। যখন ধীরে ধীরে হয় তখন মনে হয় ইতিহাস এগিয়ে চলছে সাপের মত এঁকে বেঁকে ধীর মন্থর গতীতে। কখনো আবার ঠিক উল্টো ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে এগিয়ে যায়। হুরমুড় করে ইতিহাস পরিবর্তন ঘটে। সারা দেশে সাড়া জাগিয়ে পুরাতনের অচলয়াতন ভেঙ্গে নতুন সমাজ ব্যবস্থা এগিয়ে চলে।

রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, সম্পদ প্রভূতি গড়ে তোলে মানুষ। এ মানুষের ইতিহাস যথার্থ ইতিহাস। ইতিহাস সর্বদা উন্নতির পথে ধাবিত। মুখে মুখে সাধারণ সব মানুষের অতীতের প্রতি একটা মোহ থাকলেও এবং সর্বদা অতীত ভাল ছিল বলে হাহুতাশ করলেও প্রকৃত পক্ষে ইতিহাস হলো মানব মুক্তির এক বিরাট নাটক।

প্রচীন আমলে এ দেশে কবি-সাহিত্যিক ছিলো। তাঁরা শুধু এদেশের রাজ-রাজাদের কথাই বলতো বা লিখতো। শ্রমজীবী নিম্নস্তরের জনগণের যে একটা মানবজীবন ছিলো, সংস্কৃত ছিলো, তা এই সব কবি-সাহিত্যিকের লেখায় স্থান পেতো না। কৃষি, শিল্প ও বানিজ্যের সাথে যারা জড়িত ছিলো, তারা সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ বলে ঘৃণিত ছিলো। কিন্তু কৃষিই ছিলো এদের প্রধান কাজ।

একটু জ্ঞানী, শিক্ষিত যারা ছিলো তারাই ছিলো সমাজের মোড়ল। বুদ্ধির জোরে উৎপাদনের দায়িত্বে থেকে রেহাই পেতো তারা। যারা উৎপাদন করতো শ্রম দিতো তারা সমাজের ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হতো।

ধনী লোকেরা সোনা, রূপা ও তামার পাত্র ব্যবহার করতো। গরীব ও শ্রমজীবী মানুষেরা মাটির পাত্র ব্যবহার করতো। গরীব লোকেরা ভাত, শাক, মরিচ সামান্য তরকারী ঝোল খেত। দধি, মিষ্টি জুটত খুবই কম। পান্তা ভাত গরীবদের প্রধান খাদ্য ছিলো। সমাজের ধনীরা সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলো। যারা ধনী ও জ্ঞানী ছিলো তারা লম্বা ধুতী পরিধান করতো। যারা মাঠে কাজ করতো যারা গরীব ছিলো, তারা পড়তো লেংটি।

ধনীদের জীবনে সুখ-শান্তি ছিলো্। ধনীদের স্ত্রীগণ বাইরে যেতেন না। মহিলারা অলংকার পরে সাজসজ্জা করে ঘরে বসে থাকতে ভালবাসতো। তারা সোনা, রূপা ও হাতির দাঁতের অলংকার ব্যবহার করতো। নারীরা খুব সুন্দরী ও পর্দানশীল ছিলো। কিন্তু তাদের কোন স্বাধীনতা ছিলো না। অপর দিকে গরীবদের সমাজে দুঃখ কষ্ট লেগেই থাকতো। 'হাড়িতে ভাত নেই'-সংসারের সব কিছুই শূন্যের কোঠায়। অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতো। ক্ষুধায় শিশুদের চোখ বসে গেছে। পেট পিঠে লেগে গেছে। মলিন কাঁথা-বালিশ ছেঁড়া,

পরিধানের বস্ত্র ছেঁড়া, জীর্ণশীর্ণ ঘর, চাল ওড়ছে, বেড়া ভেঙ্গে আছে। নিত্য দিনের ঝড়ে ঘর-বাড়ি, ফসল-জনপদ নষ্ট হয়ে যেত। ঝড়ের পর শতশত মানুষ না খেয়ে মরে যেত। মহামারীতে গ্রাম থেকে গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ত। এদের সাহায্য করার মত কেউ ছিলো না। চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

এক দিন গ্রামের কৃষক ও শ্রমিকগণ জীবনে বাঁচার তাগিদে পরিশ্রম করে প্রচুর কৃষিপণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। কৃষিপন্য রপ্তানী করে প্রচুর দেশ বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এদেশ ধন-সম্পদে ভরপুর হয়ে উঠে। আর এদিকে গ্রাম ও নগর জীবনে পার্থক্য সূচীত হয়। নগর জীবন ঐশ্বর্য ও বিলাসে ভরপুর হয়ে উঠে। কৃষকদের কষ্টে সঞ্চিত ধন ও বানিজ্যের আয় দিয়ে নাগরিক জীবন গড়ে ওঠে। শহরে ধনী ও অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি হয়। তাঁরা অবসর সময়ে নৃত্য-গীত উপভোগ করে সময় কাটাত। গ্রামের লাখ লাখ জনগণের জীবনে অবসর ও বিনোদনের কোন সুযোগ ছিল না। সব জিনিসের মূল্য কম থাকলেও কৃষকদের জীবন যাত্রা উন্নত মানের ছিল না।

নবাব ও জমিদারী প্রথা চালু হওয়ায় তারা বিলাস জীবন যাপন শুরু করে। সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তারা কোন পথ নির্দেশনা দিত না। জমিদার ও তাদের কর্মচারীদের অন্যায় ইচ্ছা বা বাসনা পূর্ণ করতে এদেশের সাধারণ লোকদের জীবন পর্যন্ত দিতো হয়েছে। জমিদার ও ধনী শ্রেণীর নৈতিক চরিত্র উন্নত ছিল না। কৃষক শ্রমিক শ্রেণী থেকে তারা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। সাধারণ জনগণের নিরাপত্তার অভাব ছিল। মগ-পতুর্গীজ ও জলদস্যুদের অত্যাচারে সমাজ জীবনকে বিধ্বস্ত করে ফেলে। আর প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে সাধারণ জনগনের বেঁচে থাকতে হয়েছে।

জমিদার ও ধনীরা নারী, মদ-জুয়া নিয়ে দিন কাটাত। অন্য দিকে সাধারণ জনগন ধর্মীয় কুসংস্কার সমাজ জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখে ছিলো। তাছাড়া উন্নত জীবন গঠনের চেতনার অনুপস্থিত, ধর্মীয় কুসংস্কার, বেঁচে থাকার অনিহা, ভাগ্যের উপর নীর্ভরশীলতা এ অঞ্চলের সমাজ জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখে ছিল। খাজনা না দিলে কৃষকদের ভিটেমাটি ছাড়া করা হতো।

কৃষকগণ দলবদ্ধ হয়ে জমিদারদের নিপীড়ণের প্রতিবাদ করা শুরু করে। ফলে নেমে আসল সীমাহীন অত্যাচার। প্রতিবাদ করায় অন্ধ কূপে অনেক নিরীহ কৃষককে প্রাণ দিতে হলো। গরম তেলে ভাজা করে অনেককে হত্যা করা হয়। একই পরিবারের ৮ জনকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। শুরু হলো কৃষক বিদ্রোহ ও প্রজা আন্দোলন। হাজার হাজার লাঞ্ছিত নিপীড়িত কৃষক ঐক্য বদ্ধ হলো। জমিদার-তালুকদারদের বিরুদ্ধে দুর্ধষ কৃষক নেতা ও জাগ্রত কৃষকের অবিরাম সংগ্রাম। কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁদের সংগ্রামী লেখনির মাধ্যমে জমিদারদের বিরুদ্ধে শোষিত জনগণকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়। এ সংগ্রামে কেন্দ্র করেই একদিন কৃষকদের জয় হয় এবং জমিদারদের হয় পতন।

এদেশের সাধারণ জনগণ সুখের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। জীবন উন্নয়নের লক্ষ্যে জ্ঞানার্জনের বিষয়টি শীর্ষে স্থান পায়। নিম্ন শ্রেণী থেকে মানুষ উন্নত মানের জীবন যাপনের পথ খুঁজতে থাকে। আধুনিক জীবন, আধুনিক সংস্কৃতি ধারায় জীবন চলার গতি লাভ করে। সমাজের চিন্তা-চেতনাকে বদলানোর জন্য মুক্ত চিন্তার অধীকারী ব্যক্তিত্বের আর্বিভাব ঘটে।

সর্বশেষ আন্দোলন ও পরিবর্তন সূচীত হলো একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের সর্বস্তরের জনগণের গৌরব ও গর্বের ইতিহাস। সে ইতিহাস আমাদের সমাজ জীবনের সবচেয়ে বড় পরিবর্তনের ইতিহাস। স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিলো বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের নতুন প্রজন্ম কম্পিউটার ও উপগ্রহের মাধ্যমে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্ত নির্ভর সর্বাধুনিক শিক্ষার সুযোগ পাবে। বিরাজমান জরাজীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল সংস্কার হবে, প্রণীত হবে যুগোপযোগী শিক্ষা, শিল্প ও স্বাস্থ্যনীতি।

কিন্তু দেখা যায় আজকের নতুন প্রজন্ম এক কঠিন দুঃসময়ের মুখোমুখি। দেশের শিক্ষাঙ্গনে অব্যবস্থা, শিল্প কারখানা বন্ধ, শ্রমিক অসন্তোষ, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অব্যবস্থাসহ বর্তমান ও নতুন প্রজন্ম এক জটিল ও কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত। দেশ হত্যা, খুন, ছিনতাই, দূনীতি, সন্ত্রাস ও অপরাজনীতিতে ছেয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের নিরাপদ ও বিকশিত জীবন নিশ্চিত করার অপরিহার্য বিষয়টি আজ এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

কালের প্রবাহে ও দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শুধু বক্তব্যের ভাষা কিছুটা হেরফের হয়েছে মাত্র। রাজনৈতিক ধারা পরিবর্তন হয়নি। রাজনৈতিক অঙ্গনে দেশ প্রেমিক রাজনৈতিকদের চরম অভাব। সহিষ্ণুতার অভাব, সাধারণ মানুষের প্রতি দায়-বদ্ধতার অভাব। আজ দেশ ও সাধারণ জনগণের প্রতি প্রগাঢ় দায়িত্ববোধের অভাব রাজনীতিতে প্রকট। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে, প্রত্যেকটি ছাত্র-যুবকসহ বিভিন্ন ফ্রন্টেই তীব্র হয়ে উঠেছে অর্ন্তবিরোধ, দলাদলি, সংঘর্ষ এবং ভাঙ্গন। আর এ থেকে ফায়দা লুটছে দেশের চিহ্নিত স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি গুলো।

রাজনীতিকরা ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার কথা সব সময়ই বলেন। তাদের দলীয় মেনিফেস্টোতেও রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য নানা হিতকরী কাজের ফিরিস্তি থাকে। দুঃখের বিষয়, রাজনীতিকরা যখন ক্ষমতায় যান, তখন তাদের কাজে এসব হিতকরী কার্যক্রমের প্রতিফলন প্রায়শঃ দেখা যায় না। যা সাধারণত দেখা যায় তা হলো রাস্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হতে শুরু করে সবকিছু দলীয়করণ করে ফেলা।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুন্ঠন ও দূর্নীতির ছড়াছড়ি। আজ দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। নেতা-নেত্রীদের কথা ও কাজের মধ্যে বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। লোভ, হিংসা, ঈর্ষাকাতরতা, ক্ষমতার দাপট ও অন্তর্কলহ প্রকট আকার ধারণ করেছে।

সকলের প্রত্যাশা রাজনৈতিক দলগুলো দেশের আপামর জনসাধারণের উন্নতিকল্পে দূর্নীতি, সন্ত্রাস, অপরাজনীতি বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে একটা মৌলিক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। এ মুহূর্তে প্রযোজন এদেশের সকল রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ এবং বুদ্ধিজীবী মহল অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে দূর্নীতি, সন্ত্রাস, অপরাজনীতি থেকে পরিত্রাণ পাবার লক্ষ্যে বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করে জনগণকে নিয়ে মাঠে নেমে আসা। যাতে আগামী প্রজন্ম নিরাপদ ও বিকশিত জীবন নিশ্চিতকল্পে ধীরে ধীরে এগিয়ে ইতিহাসের বির্বতন ঘটাতে পারে।

* দৈনিক আজকের পরিবর্তন - ০৩ আগষ্ট ২০০৪ খ্রীঃ
* দৈনিক ভোরের ডাক - ১৩ আগষ্ট ২০০৪ খ্রীঃ
* দৈনিক মতবাদ - ০১ অক্টোবর ২০০৭ খ্রীঃ
* সাহিত্যের আড্ডা চতুর্থ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১২ এ প্রকাশিত

আমি, আমার মন ও আত্মসমালোচনা

“বাঙ্গালীর ইতিহাস” নামক গ্রন্থে বাঙ্গালীর উৎস বৃত্তান্ত বর্ণনা করে গ্রন্থকার বলেছেন- প্রাচীন ভেড্ডিড জাতি হতে ক্রমবিবর্তনের ধারায় আধুনিক বাঙালী জাতির উদ্ভব। ভেড্ডিপদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে যেয়ে তিনি বলেছেন এরা হচ্ছে পরশ্রীকাতর, অলস, প্রতিহিংসা পরায়ন, নিষ্ঠুর, কল্পণা প্রবণ, উচ্চভিলাসী এবং আত্মকেন্দ্রিক। আমার আত্মসমালোচনা উক্ত গ্রন্থকারের বিশ্লেষণের সাথে কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ উহা বিচারের সময় হয়েছে আজ।

বিভিন্ন সময়ে গুণীজনেরা বলে থাকেন, আত্মসমালোচনা ছাড়া কেহ বড় হতে পারে না। তাই আত্মসমালোচনা করা দরকার। নিজকে শুধরাইবার জন্য সর্বাপেক্ষা বড় উপায় হ'ল আত্মসমালোচনা। আমার বড় হ'বার বাসনা অত্যন্ত তীব্র। তাই গুণীজনদের মহান বাক্য আত্মস্থ করে আজ আমি আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই। দোষে গুণে মানুষ। আমারও অনেক দোষ গুণ আছে। আমি সাধারণতঃ দোষ গুলোকে ঢাকা দিয়ে গুণগুলোকেই সর্বজন সমক্ষে প্রচার করে থাকি। কিন্তু আজ সততার সাথে আমি আমার দোষাবলী বর্ণনা করে পাপমুক্ত হতে চাই।

আমার একটি দোষ হ'ল নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করা। আমি আমার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন কিন্তু এ সীমাবদ্ধতার কথা যাতে অন্য কেহ না জানতে পারে, সেজন্য এরূপ উচ্চ ধারণার কথা প্রচার করে আমি আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকি। আমি মনে করি উচ্চ ধারণা এবং নিজকে বিশাল করে ভাবার মধ্যে একটা স্বপ্নের ব্যাপার আছে। এ স্বপ্নই এক সময় আমাকে সমস্ত সীমাবদ্ধতার জলাশয় হতে উদ্ধার করবে।

আমার সাথে যাদের বন্ধুত্ব, তারা অবশ্যই আমার সম্মুখে কখনও এ বিষয় নিয়ে আলোচনা উঠায় না। যথেষ্ট নম্রতার সাথে তারা বিষয়ান্তরে যাওয়ার জন্যই উদগ্রীব হয়। এ ব্যাপারে কেহ যদি বির্তক তুলে তাহা হলে উহা আমার ক্রোধ উৎপাদন করে। কারণ আমি অন্যের সমালোচনা করতে যতখানি আনন্দ অনুভব করি। নিজের সমালোচনায় ঠিক ততখানিই ব্যথিত হই। আমার বিশ্বাস এখানে সমালোচনার নামে কেবল ক্রুদ্ধ আক্রমনই করা হয়ে থাকে যা কোন অবস্থাতেই মানুষ্য চরিত্র সংশোধনের সহায়ক নহে।

অনেকে আমার অসাক্ষাতে আমাকে প্রতিহিংসা পরায়ন বলে থাকেন। এ কথার মধ্যে সামান্য কিছু সত্যতা আছে। আমি সমালোচককে অবশ্যই চিহ্নিত করি। এর কারণ আমি মনে করি, যে আমার সমালোচনা করে সেও আমার মতই প্রতিহিংসা পরায়ন ও পরশ্রীকাতর। সে আমাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে।

আমি নিঃসন্দেহে উচ্চভিলাষী। কারণ আমি মনে করি, যার উচ্চভিলাস নেই, সে জীবন দ্বারা প্রতারিত। মানুষ তার আশার সমান বড়। সে যদি নিজের স্বপ্নকে প্রসারিত না করতে পারে তা হ'লে তার জীবণের কতটুকু মূল্য আছে ? মানুষের মধ্যে যদি বড় হওয়ার আকাঙ্খাই না থাকে তা হলে তো সে জড় জীবনের প্রতিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। রাধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পর রাধা/ সারা জনম এক চাকাতেই বাঁধা”- এ জীবন তো কোন অবস্থাতেই জীবন নয়।

অতএব উচ্চভিলাষকে আমি কোন অবস্থাতেই দোষ বলে মনে করি না। একথা ঠিক এ উচ্চভিলাষকে বাস্তবে রূপদান করতে হলে অন্য অনেককে ইহার চাকায় চাপা দিতে হয়। গরুর উদর পুর্তির জন্যই ঘাসের প্রাণ দেয়। আবার আমাদের খাদ্য তালিকাতে প্রোটিন সমৃদ্ধ করার জন্যই গরুদের মৃত্যু বরণ করতে হয়। জীব জগতের এ নিয়মের মধ্যে অপরাধ কোথায় আমি জানি না। অতএব আমার উচ্চভিলাষ যদি কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্থ করে সেজন্য আমি জীব জগতের নিয়মকেই দায়ী মনে করি, আমাকে নয়।

প্রতিযোগিতামূলক এ পৃথিবীতে "সার ভাইব্যাল অব দ্যা ফিটেষ্টই" হতেছে চরম এবং পরম সত্য । অতএব যে বাঁচে সে মাথা উচু করে দাঁড়াবে। সে তো আপন যোগ্যতার বলেই দাঁড়াবে।

আমার ভেতরে প্রচন্ড লোভ আছে। অন্যদের মত বিলাসী এবং চাকচিক্যময় জীবন ধারা আমারও অত্যন্ত পছন্দ। আমার এ লোভ চরিতার্থ করার ব্যাপারে আমি যে কোন পর্যায়ে যেতে পারি। কিন্তু তা করতে পারিনা বলে কেবল আমার মানসিক ভীরুতার কারণে। পাছের লোকে কিছু ভাবে, পাছে লোকে কিছু বলে এ কথা ভেবেই আমি নিজেকে দমন করি। নিজকে সৎ বলে প্রচার করে বাহবা কুড়ানোর চেষ্টা করি। কিন্তু সত্য হলো আমার সততা যদি কিছু থেকেও থাকে তবে তাহা কেবল আমার দুর্বলতা জনিত কারণে।

আমার ভেতর পরশ্রীকাতরতা প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান। কারো ভালো কিছু হতে দেখলে আমি মুখে যত প্রশংসাই করি না কেন, অন্তরটা অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির কোন ক্ষতি না হতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার স্বস্তিই থাকে না। কি কারণে এরূপ মানষিকতার জন্ম হ'ল বলতে পারব না। সব জিনিসেরই যেমন কোন না কোন কারণ থাকে, তেমনি এ ধরণের মানসিকতার ও একটা না একটা কারণ আছেই।

সে কারণ আমার সম্পূর্ণ অজানা। ইহা আমি অঙ্গীকার করে বলতে পারি। আসল চেহারা গোপন রেখে মেকী চেহারা তুলে ধরাকে যদি ভন্ডামি বলা হয়, তা হলে সে অর্থে আমি ভন্ডও বটে। তবে এ ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বলতে হয় ভন্ডকে নয় ? মনের মধ্যে যে কথা বা যে ইচ্ছা সর্বক্ষণ তির তির করে উহা প্রকাশ্যে জাহির করতে পারে। এমন কে আছে ? ভেতর ও বাইরে কোন প্রভেদ নাই হয় সে উম্মাদ না হয় সে মনুষ্যপদ বাচ্য নয়।

মানুষের স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ শালীনতা সব কিছুই তো কোন না কোন ব্যাপার ভান্ডামি বটে। কিন্তু যেহেতু সেগুলো একটা মাত্রার মধ্যে থাকে এবং সেগুলো কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্থ করে না সেহেতু সেগুলো সৌজন্য কিংবা শালীনতা বলে পরিগণিত। ঐ মাত্রা বা সীমারেখা অতিক্রম করে গেলে উহা ভন্ডামি বলে পরিচিত হয়।

আমি মিথ্যাচার করি। নিজের অস্থিত্বের জন্য । নিজকে রক্ষার জন্য মিথ্যাচার অতীব প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি। এমন কে আছে, যে কখনও কোন অবস্থাতেই মিথ্যাচার করে নাই। সত্যের সঙ্গে মিথ্যার ব্যবধানতো একটি চুল অপেক্ষোও কম। তদুপরি মিথ্যা হতেছে সৃজনশীলতা । যার কল্পনা শক্তি প্রবল, যার প্রতিভা আছে কোন কিছু সৃজন করার তাকে তো মিথ্যার আশ্রয় লইতেই হবে। না হলে বুঝতে হবে সে হল রোবোটের মত মেধাহীন।

- দৈনিক শাহানামা - ০২ নভেম্বর ২০০৫ খ্রীঃ
- সাহিত্যের আড্ডা তৃতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১১ এ প্রকাশিত

ইসলামী দর্শন এবং কলেমার প্রয়োজনীয়তা

অন্যান্য দর্শন যেমন ইসলামী দর্শনেরও তেমনি একটি বিশেষ লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা আল্লাহর স্বরূপ, মানুষ ও জগতের সঙ্গে আল্লাহর সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামের ধারণা অত্যান্ত স্পষ্ট। ইসলামি মতে আল্লাহ জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। বস্তুজগৎ এবং সেই জগতের অন্তর্ভুক্ত পদার্থ ও ঘটনারাশি অবাস্তব মায়া নয় বরং আল্লাহরই সৃষ্ট এবং সেকারণেই বাস্তব। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম জীব। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার রব-এর পার্থিব প্রতিনিধি হিসেবে। আর তাকে যথেষ্ট ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে কোরআনে বর্ণিত 'রুবুবিয়াত' বা ঐশী নীতি অনুযায়ী জগৎ ও জীবন পরিচালনার জন্য। মানুষ আল্লাহর গুনাবলী অর্জন ও রূপায়ণে সক্ষম। পরম করুণাময় আল্লাহই স্বেচ্ছায় মানুষকে এ শক্তি প্রদান করেছেন।

বিজ্ঞান জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতের দিকে অগ্রসর হতে চায়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিসর সীমিত থাকে সেসব জড়বস্তু ও ঘটনার মধ্যে যেগুলোকে শনাক্ত করা সম্ভব ইন্দ্রিয় কিংবা যন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু মানুষ তার জ্ঞানানুশীলন প্রক্রিয়াকে শুধু ইন্দ্রিয়ের চার দেয়ালে সীমিত রেখে স্বস্থি পায় না। কারণ সে

বিশ্বাস করে যে বাহিরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা- কিছু জানা যায় তার বাইরেও সত্য ও বাস্তব বলে আরো কিছু থাকতে পারে। মানুষের কৌতুহলের সঙ্গে এ বিশ্বাস মিশ্রিত হয়ে আছে বলেই জ্ঞান ও সত্যের অনুসীলনে লক্ষ করা যায় গতিশীলতা এবং একই কারণে মানুষ নিয়ত অগ্রসর হয়ে চলছে অদৃষ্টকে দেখার এবং অজানাকে জানার প্রয়াসে।

মানুষ শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। তবে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তার কিছু সৃজনী শক্তি অবশ্যই আছে। উপযুক্ত মালমশলা পেলে সে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সে সব মালমশলায় নতুন আকার ও আকৃতি দিতে পারে। যা আছে তাতে নতুন প্রাণ ও দর্শন সংযোজন করে সে এক নতুন মানবতা সৃষ্টি করতে পারে। মানুষ সমগ্র জগৎকে দর্শন ও নিয়ন্ত্রন করতে পারে না বটে ; কিন্তু সে তার প্রতিবেশীদের যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে। আল্লাহর উল্লিখিত গুনের আন্তরিক দ্বারা মানুষ ক্রমশ বিস্তৃত করতে পারে তার সৃষ্টিশীল মেধাকে এবং তত্ত্বাবধান ও বিবর্তনের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে। আর এভাবে সে অনেক দূর অগ্রসর হতে পারে ঐশীগুন অর্জন আত্তীকরণের পথে।

আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ এবং উভয়ের মাঝখানে কোনো তৃতীয় পক্ষ নেই। নিজের কল্যাণেই মানুষের উচিত আল্লাহ প্রদত্ত সব শক্তি ও ক্ষমতার সুষম বিকাশ সাধন এবং তার চারদিকের বস্তুগত পরিবেশের সদ্ব্যবহার করা। মানুষের স্বাভাবিক মর্যাদাবোধের এই যে চেতনা, অনন্ত অসীম আল্লাহর দিকে অগ্রসর হওয়ার এই যে প্রত্যয়, তা মুসলমানদের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে কলেমার একত্ববাদী নীতিদ্বারা। তাতে করে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মেও সাধিত হয়েছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বহু ঈশ্বরবাদী আমলে মানুষ নিজেকে মনে করত অত্যান্ত অসহায় বলে এবং সবকিছুকে জ্ঞান করত তার চেয়ে উৎকৃষ্ট বলে। অন্যদিকে নিরীশ্বরবাদ মানুষকে ঠেলে দিয়েছে একই সহায়তার অন্য প্রান্তে। এ পরিস্থিতিতেই কলেমা মানুষকে মুক্ত করেছে। সব কৃত্রিম বন্ধন এবং তার মধ্যে সৃষ্টি করেছে মহত্ব ও স্বাধীনতার প্রেরণা। কলেমার এই প্রেরণাশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়েই আরবদেশের উচ্ছৃঙ্খল বেদুইনরা পরিণত হয়েছিল এক মহান জাতিতে।

ধর্ম কথাটি নিয়ে অনুধা ব্যাপক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কউে ধর্মের এমন ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন যার ফলে কোনো মহল ধর্মকে দেখছেন অবজ্ঞার চোখে। কারো কারো ধারণা ধর্ম নিতান্তই একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার এবং এর সঙ্গে মানুষের পার্থিব কর্মকান্ড ও সুখ -দুঃখের কোনো সংশ্রব নেই। স্রষ্টার স্বরূপ এবং জগৎ ও মানুষর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ বর্ণনাই কর্মের কাজ। এ মতে পারলোকিক চিন্তা ধর্মের শেষ ও চুড়ান্ত লক্ষ্য । মুসলিম দার্শনিকগণ বলেন- এটাই যদি প্রকৃত অর্থ হয়ে থাকে, তা হলে বিচারশীল ব্যক্তিমাত্রই সে ধর্মের প্রতি উদাসীন তাতে সন্দেহের কারণ নেই। কিন্তু ধারণাটি আসলে সঠিক নয়। এ ভ্রান্ত ধারণা পরিবেশনার মুলে রয়েছেন ইউরোপীয় ধর্মযাজক সম্প্রদায় এবং প্রাচ্যের মোল্লা ও পন্ডিতগণ। নিজেদের সংকীর্ণ স্বাথেই তাঁরা এ বাঞ্ছিত অর্থে ব্যবহার করছেন ধর্মকে এবং এভাবে ক্ষুন্ন করেছেন ধর্মের সুনাম ও ভাবমূর্তি। ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ধর্মযাজকগণ মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ও যথার্থ প্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের তাঁরা নিয়ার্তন করেছেন ধর্মবিরোধিতার অভিযোগে এবং আরও নানা কৌশলে স্তব্দ করে দিয়েছেন স্বাধীন চিন্তার স্বাভাবিক ধারাকে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায় ধর্মলিয় ব্যবহার করেছিল আধিপত্য ও শোষণ কায়েমের হীন লক্ষ্যে। ফলে ধর্মের প্রতি মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আস্থাহীন হয়ে পড়ে।

মানুষে মানুষে ভেদাভেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাক্ষণ্য সমাজ ব্যবস্থায় ইসলামের সাম্যের বাণী যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল একথা সর্বজনবিদিত। সাধারণত ধর্ম বলতে বোঝান হয় কিছু আচার-অনুষ্ঠানকে। ইসলাম এ ধরণের একটি নিছক ধর্ম নয়। আজকাল বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃত ইসলাম-তা-ই। একটি বৈজ্ঞানিক জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম কার্যকর রয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের দিকনির্দেশক হিসেবে। ইসলাম মানুষকে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গি প্রদান করেছে তার সঙ্গে একটি নৈতিক জীবনাদর্শ যুক্ত। উদারনীতির নামে ইসলাম মানুষকে কোন একপেশে কিংবা উগ্র জীবননাচরন অনুশীলনের পরামর্শ দেয় না। ধর্মের নামে জঙ্গী হামলার কোন যুক্তিই ইসলামে নেই। ইসলাম মানবজীবনকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করতে চায় কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে। কোরআনে তাই মানুষকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে-"যারা পৃথিবীতে অনিষ্ট করে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করে।"

ইসলামি মতে, জগৎ একটি উদ্দেশ্যের রাজত্ব। জগৎসৃষ্টির পেছনে আল্লাহর যে মুল উদ্দেশ্য কার্যকর সেটি হল ক্রমিক বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টিকে অধিক থেকে অধিকতর সুন্দর করা। মানুষের যে সব কর্ম ও আচরণ পরমস্রষ্টা আল্লাহর এ উদ্দেশ্য অর্জনের পক্ষে সহায়ক সেগুলো যথোচিত এবং সেগুলা এর প্রতিকুল সেগুলো অনুচিত। এটি কোরআনের একটি প্রধান নৈতিক শিক্ষা। এটিই মুসলমানদের ওপর কলেমার নৈতিক প্রভাব। কলেমার নৈতিক ব্যঞ্জনা মানব প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আর সেজন্যই এর সুষ্ঠু প্রয়োগ ও অনুশীলন দ্বারা মুসলমানরা সব মহলে স্বীকৃতি ও প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছিল একটি মহান জাতি হিসেবে। মুসলিম দার্শনিকদের মতে-"আইন যেখানে ব্যর্থ হল, গণসতকর্তা ও নিন্দা যেখানে ব্যর্থ হল এবং অনিশ্চিত অতীন্দ্রিয় কর্তৃপক্ষ যেখানে ব্যর্থ হল, সেখানেই সফল হলো কলেমা।" কলেমার এই মূল্য ও কার্যকারিতা কোনো সাময়িক ব্যপার নয় ; কলেমার আবেদন চিরন্তন ও শ্বাশত। তাই

অতীতের আরবের মরুভূমিতে কলেমা যেমন সাফল্যের সঙ্গে অনুপ্রাণিত করেছিল কুসংস্কারাবদ্ধ আরবদের। সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিল তাদের নৈতিক চেতনা ও মূল্যবোধকে। ভবিষ্যতেও সেই একই কলেমা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে পৃথিবীর সব অঞ্চলের মানুষকে ।

* দৈনিক দাক্ষিণাঞ্চল - ৩১ অক্টোবর ২০০৭ খ্রীঃ
* 'সাহিত্যের' আড্ডা ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১৪ এ প্রকাশিত

পাকিস্তানী দুঃশাসন থেকে আজ বরিশাল মুক্ত

মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম একাত্তরের এপ্রিল মাসে মুজিবনগর সরকার সমগ্র রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে বরিশাল জেলাকে ৯ নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভূক্ত করে। বরিশাল জেলার বাসিন্দা মেজর জলিলকে ৯ নম্বর সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১১টি সেক্টরের অন্যতম ৯ নম্বর সেক্টর যার ভৌগোলিক অবস্থা বিশেষ কয়েকটি কারণে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমতঃ বাংলাদেশের দু'টি সামদ্রিক বন্দরের মধ্যে একটি এ সেক্টরের অর্ন্তগত। দ্বিতীয় বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক বনভূমি সুন্দরবন এ সেক্টরেই। এ সেক্টরের ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন ও সামদ্রিক বন্দরের কারণে খুলনা এবং বরিশালের একটি অতিরিক্ত গুরুত্ব ছিলো। ৯ নম্বর সেক্টরে নৌ-কমান্ডারা অক্টোবর মাসের মধ্যেই মোংলা বন্দর অকেজো করে দেয়। সুন্দরবন একটি দূর্গম বনাঞ্চল যার নিয়ন্ত্রণ সব সময়েই মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ছিল। নবম সেক্টরের ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে বিচ্ছু বাহিনী গঠন করা হয়। এ সেক্টরের আরও একটি ব্যতিক্রম ছিলো মহিলা গেরিলা সদস্য। গেরিলা ও নৌযুদ্ধ মুলতঃ এ সেক্টরেই অনুষ্ঠিত হয়ে ছিলো।

অক্টোবর মাস পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিপুল সংখ্যক অফিসারসহ কয়েক হাজার সেনা নিহত ও আহত হন। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এমন একটা অবস্থা বিরাজ করছিলো যখন সন্ধ্যার পর কোন ব্যাংকার বা ক্যাম্প থেকে পাকিস্তানী সেনাদের বাইরে আসা দুরহ হয়ে পড়ে। বরিশাল এলাকাতে দিনের বেলাতেও পাকিস্তানী সেনাদের যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। নবম সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী সেনাদের ওপর অতর্কিতে হামলা অব্যাহত রেখে পাক সেনাদের অবস্থা বিপর্যপ্ত করে দেয়। ঠিক এ মুহূর্তে প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল নিয়াজী ফরমান জারী করলেন যে,"কমপক্ষে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সৈন্য হতাহত না হওয়া পর্যন্ত কোন পজিশন থেকে পশ্চাদপসারণ করা যাবে না।"

এ সত্বেও ৯ নম্বর সেক্টরের বীর মুক্তিযোদ্ধারা তুমুল যুদ্ধ করে বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার থানা সমূহ মুক্ত করতে থাকে। প্রচন্ড আক্রমনের ফলে ১৬ নভেম্বরের মধ্যে প্রায় সব থানা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসে। ৩০ নভেম্বরের পর পাকবাহিনী শুধু নিজ নিজ ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান নেন। ৩ ডিসেম্বর শুরু হয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। ৫ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা সাতক্ষীরা জেলা দখল করে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করতে সক্ষম হয়। এ যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সাব-সেক্টর কমান্ডারসহ অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন বরিশাল এলাকার।

যশোর ও খুলনা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচন্ড আক্রমনের মুখে অনেক পাক সেনা পলায়ন করে লঞ্চযোগে বরিশাল এসে ওয়াপদা কলোনীতে আশ্রয় নেন। কয়েকজন থানা কমান্ডার বরিশাল শহরের চারিদিকে অবস্থান নেন। এ খবর ওয়ারলেসের মাধ্যমে পৌছে যায় মিত্রবাহিনীর কাছে। মিত্রবাহিনী ৬ ও ৭ ডিসেম্বর রহমতপুর বিমান ঘাঁটিতে দু'টি বোমারু বিমান ব্যাপক বোমা বর্ষণ করে বিমান ঘাঁটি অকেজো করে দেয় ।

৮ ডিসেম্বর সকালে হঠ্যাৎ করে বরিশাল শহরে কার্ফু ঘোষণা করে। বরিশাল ওয়াপদা কলোণী থেকে সকল সেনা কয়েকটি লঞ্চযোগে বেলা ১১টায় স্টীমার ঘাট ত্যাগ করে। শান্তিবাহিনীর কয়েকজন উর্ধতন সদস্য এ লঞ্চযোগে পালিয়ে যান। বরিশাল স্টীমার ঘাট হতে লঞ্চগুলো ছেড়ে যাবার পরই শহরের কার্ফু শিথিল হয়। নিকটবর্তী মুক্তিযোদ্ধারা শহরে এসে পরে এবং শহরবাসী জানতে পারে পাক সেনারা বরিশাল থেকে পালিয়ে ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছে। এ সংবাদে ঘর থেকে মানুষ রাস্তায় নেমে আসে এবং জয়বাংলা স্লোগানে শহর মুখরিত করে তুলে। এ সংবাদটি বরিশালের মুক্তিযোদ্ধারা ওয়ারলেসের মাধ্যমে মিত্রবাহিনীর কাছে পৌঁছে দেয় ।

বর্বর পাকবাহিনী লঞ্চগুলো আস্তে আস্তে চরবাড়িয়া ও শায়েস্তাবাদ হয়ে মীরগঞ্চ অতিক্রম করতে থাকে। যে পথে ২৫ এপ্রিল ঢাকা থেকে বরিশাল আক্রমন করে ছিলো ঠিক একই পথ ধরে পালিয়ে যেতে থাকে। মীরগঞ্চ থেকে একটু সামনে এগুতেই মিত্রবাহিনীর বোমারু বিমান লঞ্চগুলো লক্ষ্য করে বোমা ও গুলী বর্ষণ করতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে লঞ্চগুলোতে আগুন ধরে যায় এবং নদীতে ডুবে যায়। বোমা হামরায় লঞ্চে আগুন ধরায় ধোঁয়া তালতলী থেকে দেখা গিয়েছে। লঞ্চগুলো ডুবে যাওয়ায় পাক সেনারা নদীর পশ্চিম পাড়ে ঠাকুরমল্লিক ও পূর্ব পাড়ে নন্দিরবাজারে উঠার চেষ্টা করে। এ সময় হাজার হাজার গ্রামবাসী ও মুক্তিবাহিনী ছুটে আসে। গ্রামবাসীরা গণপিটানি দিয়ে, কুপিয়ে এবং পানিতে চুবিয়ে পাকসেনাদের নির্মমভাবে হত্যা করে। গ্রামের

মহিলারাও ঝাড়ুদিয়ে পিটিয়ে মনের কষ্ট প্রশমিত করে। চারিদিকে সবাই বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ে।

৮ ডিসেম্বর উন্মত্ত দুঃশাসন মুছে নতুন করে বরিশালের সকল বাসভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়তে থাকে। ইতিঘটলো এক নৃশংসতার। স্বাথক হলো ৮ মাস পূর্বে অর্থাৎ ২৫ এপ্রিল-৭১ প্রথম পাকবাহিনী বরিশাল আক্রমনকালে চরবাড়িয়া ইউনিয়নের ৪৭ জন শহীদদের জীবন দান। আমরা ভুলতে বসেছি সে সব বীরযোদ্ধা ও শহীদদের যাদের বুকের রক্তে উর্বর হয়েছে বরিশালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। যাদের অবিস্মরণীয় অবদানে এদেশ হয়েছে শৃঙ্খলামুক্ত। পল্লী গ্রামে সে দিনের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সে সব শহীদদের কবরগুলো সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা আজও হলো না।

* দৈনিক দাক্ষিণাঞ্চল - ৮ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রীঃ
* দৈনিক শাহনামা - ৮ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রীঃ

আরজ আলী মাতুব্বর ঃ এক অপ্রকাশিত অধ্যায়

কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর চাইতে আলাদা ? এটি একটি জনপ্রিয় প্রশ্ন। অনেকের মতে মানুষ তার চিন্তা শক্তির কারণে অন্যান্য প্রাণীর চাইতে আলাদা। মানুষই চিন্তা শক্তির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নিজেকে আপ ডেট করতে পারে। আবার প্রাণী হিসেবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বের করতে গিয়ে একজন বিজ্ঞানি যুক্তি দিয়ে বলেছেন "একমাত্র প্রকাশযোগ্য আবেগ দিয়েই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করা সম্ভব"। দীর্ঘ দিন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের পর রায় দেন-মানুষ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব। কারণ মানুষই একমাত্র প্রাণী যে কারণে অকারণে রাগ করতে পারে। এক মৃত্যু ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক রাগ অনুরাগের ঘটনা ঘটে বরিশালের প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চল লামচরী গ্রামে। মৃত্যু মায়ের ছবি তোলাকে কেন্দ্র করে ঘটে যায় নির্মম ঘটনাটি। ছবি তোলা ধর্মবিরোধী, ইসলাম ও শরিয়তবিরোধী কাজ। একজন মুসলিম মায়ের ছবি তোলায় গাঁয়ের কেই জানাজা পড়তে রাজি হলোই না বরং রাগ করে বসলেন যুবক আরজ আলীর মৃত মায়ের প্রতি।

আরজ আলী চিন্তা করলেন অপরাধ, অন্যায়, পাপ বা গুনাহ করতে পারে কেবল জীবিতরাই। আর সে অপরাধে অপরাধী তো মৃত মা নয়। এ প্রশ্ন আরজকে তাড়িত করে। যার ফলশ্রুতিতে রাগ হলেন ধর্মবিরোধ, ইসলাম ও শরিয়তবিরোধী ফতোয়াবাজদের সাথে। রাগের অনুভূতি আরজ আলীর মনে গভীর রেখাপাত করে। ভীষণভাবে ভাবায় কীভাবে এই ধর্মের মুখোশধারীদের মুখোশ খোলা যায়। কীভাবে এই কুসংস্কারের এই ফতোয়াবাজদের বীষ দাঁত ভাংগা যায়। সেই সঙ্গে জন্ম দেয় অনেকগুলো প্রশ্নের। বহু প্রশ্নের ভিড় এসে উতলা করে তোলে। ভাবলেন বুঝতে হবে, শিখতে হবে- কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা। কোনটি যুক্তির আর কোনটি অন্ধত্বের। এ সব থেকেই সত্যের সন্ধ্যানে আরজের যাত্রা শুরু। ২৬ বছর এক নাগাদ অধ্যায়ন করে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হলেন।

অনেক বাঁধা আর কুসংস্কারের প্রাচীর পেরিয়ে নিজকে বিকশিত করছেন। সমাজকে দিয়েছেন জ্ঞানার্জনের অন্যান্য সুযোগ। তার প্রকাশনাগুলো উন্নতমানের এবং অনবধ্য সুন্দর।

চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করার জন্য যত উপায় উপকরণ আছে তার মধ্যে যৎ কিঞ্চিৎ উপকরণ নিয়ে তিনি এ কাজটা করেছেন। তিনি কাগজ কলম ধরেছেন বটে কিন্তু সে চাষীর হাতের কাগজ কলম। যে হাতে জমি চষেছে, শস্য ফলিয়েছে। সেই হাতে তিনি কলম ধরেছেন। এ হাতটি খুব শক্ত। কঠিন বাস্তবের হাত। একজন দার্শনিক বা বুদ্ধিজীবির হাত শ্রমমুক্ত আদুরে, খুব নরম। তারা যে কলম দিয়ে লেখেন সে কলমটি স্বপ্নভুক। আরজ আলী মাতুব্বর কাগজ অ কলম থেকে শুরু করে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য নিম্নতম উপকরণ নিয়েছিলেন। সবটাই নিজের ভিতর থেকে করেছেন। এটাই হচ্ছে আরজ আলী মাতুব্বরের মৌলিকত্ব। তার চিন্তার মৌলিকত্ব। তার মৌলিক চিন্তা যে তার একার নয়। বাংলাদেশের অগণিত কৃষকেরও চিন্তা। তিনি যেন কোটি কোটি মানুষের পক্ষ থেকে কথা বলেছেন, প্রশ্ন করেছেন। জনগণকে যদি তাত্ত্বিকভাবে জ্ঞানী বলা যায় তাহলে আরজ আলী মাতুব্বরকে সে জ্ঞানের প্রতিনিধি বলা যায়। তিনিই সাধারণ মানুষকে শেখাতে পারেন। প্রশ্ন ছাড়া জীবন নেই, প্রশ্ন করতে করতেই জীবন এগুতে হয়। কোনো প্রশ্নের উত্তর কোথাও গচ্ছিত নেই। সব মানুষকেই নিজের নিজের মতো প্রশ্ন করতে হয় এবং উত্তর খুঁজে বেড়াতে হয়। আরজ আলী মাতুব্বর শুধু প্রশ্ন করে গেছেন বেহশত কী, দোজখ কোথায়, পরকাল কী, পরমাত্থই বা কী, তিনি জানার চেষ্টা করেছেন। ভোগ লালসার কামনায় জর্জর এ পৃথিবীর দেহখানাই আবার বেহেশতে ফিরে পাওয়া যাবে, অশেষ অফুরন্ত তৃপ্তির জন্য এ জগতের পরিবর্তে আর এ জগত মানুষ ভোগ

লালসার জন্য ফিরে পাবে একে কি বেহেশত বলা যায়। এর উত্তর পাবার জন্য আরজ আলী মাতুব্বর ব্যবহার করেন মানবজাতির মানবজগতের কান্ড জ্ঞান । সকল জ্ঞানের ওপর যার জায়গা। এখানে তিনি আপোস করেননি। এক চরম সাহস তিনি দেখিয়ে গেছেন।

অজপাড়াগাঁয়ে দু'টা পা যে মাটিতে গাঁথা আছে সেখানে বসেই জীবন ভাবনা ভেবেছেন। এ ভাবনা করতে গিয়ে তাকে প্রভাবিত হতে হয়নি। আধুনিক জীবন, আধুনিক সংস্কৃতি দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়নি। যাদের তরফ থেকে চিন্তা করেছেন তারা আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ট আশি ভাগ মানুষ। তাদের জায়গা থেকে উঠে এসেছে তার চিন্তা ভাবনা। আরজ আলী মাতুব্বর স্ব-শিক্ষিত ছিলেন। স্কুল কলেজে লেখা-পড়া করেননি। এ জন্যই তার মৌলিকত্ব ফুটে উঠেছে বেশি। এদেশের কাউকে দার্শনিক বলা কঠিন। জ্ঞান বিজ্ঞানের একটা বিশাল ইতিহাস রয়েছে। আমাদের বুদ্ধিজীবিরা অসংখ্যা পথের ঠিকানা জানে কিন্তু তারা খুঁজে পান না সঠিক পথ কোনটি। আরজ আলী মাতুব্বর খুঁজে বের করেছিলেন কোনটি সঠিক পথ। তাই এদিক থেকেই তাকে প্রথম সত্যিকারের দার্শনিক বলা হয়।

এদেশের একজন বুদ্ধিজীবীর এ কথা মুখ ফুটে স্পষ্ট করে বলার সাহস রাখে না যে,আজকের যুগের সমস্ত চিন্তা-চেতনা ও কর্মকান্ড পরিচালনার নিয়ম বিধি সরবরাহ করা কোন ধর্মের পক্ষেই সম্ভব নয়। বরং ধর্ম যারা অপব্যবহার করেছে তারা বুক ফুলিয়ে দাবি করে যে, সর্বযুগে এটা সুন্দরতম জীবন ধারা। মাতুব্বর এখানেই আঘাত করেছে।

একবিংশ দশকে পৌছে আজ খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখা। মানুষ হনন করে চলছে মানুষ। মানুষ বন্দী আর পীড়ন করে চলছে মানুষকে। তিনি ভেবেছেন প্রথাগত চিন্তাধারা মানুষের মুক্তির জন্য বাধা কোনো কিছুই শ্বাশত মহত্বের বিশ্বাস নেই। কোন কিছু মহৎ বলে প্রচারিত বলেই তা বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে হবে, তা তিনি বিশ্বাস করতে পারেনি। তাই প্রথাগত সমস্ত কিছু সম্পর্কেই তিনি প্রশ্ন করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক রীতিতে বাতিল করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পৃথিবী জুড়েই মানুষ নিজের কাঠামোতে চলতে পারছে না। বেঁচে থাকতে বাধ্য হয় অন্যের দেয়া কাঠামোতে। ওই কাঠামোতে তাকে বন্দী করে রাখে। অন্যের কাঠামোতে সবচেয়ে বেশি বাস করে এদেশের নিম্ন শ্রেণীর সাধারণ জনগণ। অন্যের কাঠামোতে বাস করে এ শ্রেণীর জনগণ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। কোন মুক্ত চিন্তার লেখকই মেনে নিতে পারে না প্রথাগত বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত, নির্দেশ। তার কাজও সব বিশ্বাস সিদ্ধান্ত নির্দেশ অতিক্রম করে যাওয়া। কোনো মননশীল মানুষের কাছেও মেনে নেয়া অসম্ভব ।

পৃথিবী এখন যে সব বিশ্বাস পোষন করে তার সবই ভুল। কেননা সেগুলো পৌরানিক, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্রগুলো মানুষকে পৌরানিক জগতে বাস করতে বাধ্য করছে। আমাদের পৌরানিক সংস্কৃতি ও অসভ্যতা থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। আজকাল যে সব বিশ্বাস পোষন করেন। তার থেকে শোচনীয় অপবিশ্বাস আর হয় না। এমন এক ধারণা হচ্ছে এখন যেনো পৃথিবীতে সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। আমাদের কাজ ওই সিদ্ধান্তগুলো মেনে চলে জীবন সার্থক করা। কিন্তু সত্য হচ্ছে মানুষ আরো কয়েক কোটি বছর বেঁচে থাকবে। তার ভবিষ্যৎ গত তিন হাজার বছরের নির্দেশে চলতে পারে না।

এক গোত্র মধ্যযুগীয় মানুষের দখলে আনতে চায় মানব সমাজকে। মৌলবাদ মানুষের বিকাশের বিরোধী। মৌলবাদীরা প্রকৃত ধর্মের কথা বলে না। বাংলাদেশ প্রতি মুহুর্তে গড়ে উঠছে পূর্ববর্তী মুহুর্তের থেকে অধিক মধ্যযুগীয়। খুব দ্রুত এখানে লোপ পাচ্ছে মুক্ত চিন্তার অধিকার। দিকে দিকে এখন প্রচার পাচ্ছে পুরানো ধ্যান-ধারণা। পুরানো ধ্যান-ধারণা অসার মহত্বে সবাই এখন মুগ্ধ। সবাই ভয় পাচ্ছে সত্য বলে। বাংলাদেশের রাজনীতি যা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে দিকে নিয়ে চলছে। এ রাজনীতি ঠেলে দিচ্ছে চরম অন্ধকারের দিকে।

সমাজের ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনাকে বদলানোর জন্য আরজ আলী মাতুব্বরের রচনাকে ব্যবহার করতে হবে। আরজ আলী মাতুব্বর সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। বিভিন্ন চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভাল হয় যদি আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাকে জায়গা করে দেয়া যায় । যারা শিক্ষা নিতে আসবে তারা যেন তার চিন্তা ধারাকে বুঝতে পারে। ভ্রান্ত ধারণা থেকে উত্তরনের এটাই পথ। পুরনো সমাজের রূপান্তর ঘটানোর পথ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সমস্ত সুব্যবস্থার মধ্যে সমগ্র জনগণকে নিয়ে আসা। সমাজের এমন একটা রূপান্তর আনা যাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উৎকট বৈষম্য না থাকে। আরজ আলী মাতুব্বরকে এখানেই ব্যবহার করা যায় যদি সাহসের সাথে বুদ্ধিজীবিরা এগিয়ে আসেন।

আরজ আলী মাতুব্বর তার সমমনা এবং ঘনিষ্ট জনকে আগ্রহ দেখিয়ে বলতো তার সাথে আলোচনা আছে এবং তার চিন্তা-ভাবনা নিয়ে কথা বলবেন। অর্থের অভাবে অনেক গুলো পান্ডুলিপি অপ্রকাশিত রেখে গেলেও তার চিন্তা চেতনার সবটুকু প্রকাশ করে যেতে পারে নি। তার চিন্তা জগতের সমাপ্তি দিতে পারে নি। আমাদের উচিত তার দেখিয়ে দেয়া সঠিক পথ ধরে অপ্রকাশিত বিষয়গুলো তুলে ধরে মানুষের অগ্রগতির পথকে সুগম করা। মানুষকে মুক্তির দিকে এগিয়ে নেয়া।

* দৈনিক আজকের পরিবর্তন - ১৭ মার্চ ২০০৫ খ্রীঃ

* 'সাহিত্যের আড্ডা' পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১৩ এ প্রকাশিত

আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র ।

অজানাকে জানার আনন্দই আলাদা। অজানাকে জানা এবং অচেনাকে চেনার দুর্নিবার আকর্ষণই মানুষকে ভ্রমনে বেরুতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। সৃষ্টি জগতকে জানার ক্ষেত্রে ভ্রমনের কোনো বিকল্প নেই। ভ্রমন এক সময় শুধু বিনোদনের মাধ্যম বলে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু এখন সে ধারণা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন ভ্রমন হচ্ছে শিক্ষার সবচেয়ে বড় উপকরণ। আবার ভ্রমন শুধু শিক্ষা উপকরণই নয়। চমৎকার এক র্অথনৈতিক খাতও বটে। বিশ্বের কোন দেশই আজ আর ভ্রমন বা পর্যটনকে বিনোদন বা শিক্ষার উপকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং এর অর্থনৈতিক সম্ভবনাকেই বেশী কাজে লাগিয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পর্যটন শিল্প অত্যন্ত দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। কোন কোন দেশ তাদের জাতীয় আয়ের বিরাট অংশই এ খাত হতে অর্জন করছে।

এক্ষেত্রে এদেশের নদী-নালা, প্রচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও পর্যটন উপযোগী করে গড়ে তুলে প্রতিবছর বিপুল পরিমান অর্থ আয় করা সম্ভব। বিশ্বে পর্যটনকে একক অর্থনৈতিক খাত বলে বিবেচনা করা হয়। এটি অন্যতম কর্মসংস্থানকারী শিল্পও বটে। পর্যটন এমনই এক শিল্প খাত যেখানে নতুন করে কোনো কিছু সৃষ্টি করা প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতি প্রদত্ত উপকরণকে শুধু রূপান্তরের মাধ্যমে পর্যটকদের জন্য আকর্ষর্ণীয় করে তোলা হলেই এ খাত থেকে অর্থ আয় করা সম্ভব।

সাধারণতঃ একজন পর্যটককে আকর্ষণ করার জন্য কিছু বিশেষ উপকরণ থাকতে হয়। নদী-নালা, মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য, বন, ঐতিহাসিক নিদর্শন এ সব উপকরণ থাকলেই সেখানে পর্যটকগণ আসতে আগ্রহী হয়। পর্যটনের সব উপকরণই আমাদের দেশে বিদ্যমান। তাই বরিশাল পর্যটন শিল্পের দিক দিয়ে অত্যান্ত সম্ভবনাময় এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। পর্যটন এমনই এক শিল্প খাত যা শুধু সরকারী উদ্যোগে বিকশিত হতে পারে না। বিশ্বের প্রতিটি দেশেই বে-সরকারী উদ্যোগে পর্যটন শিল্পের বিকাশ হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের দেশে শুধু মাত্র সরকারী উদ্যোগে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে এ শিল্পে যতটা বিকশিত হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি। বে-সরকারী উদ্যোগে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

বিভাগীয় বরিশাল শহর থেকে উত্তর দিকে মাত্র ২ কিলোমিটার দুরত্বে রয়েছে 'তালতলী নদী'। নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অনিন্দ্য অপরূপ আধারে বেষ্টিত তালতলী নদী হয়ে উঠতে পারে দক্ষিণ বাংলার "প্রাচ্যের ভেনিস" বিভাগীয় শহরের প্রায় বন্দিদশা মানুষের মুক্ত ভাবে বেড়ানোর এক আনন্দময় স্থান। যা 'ফয়েস লেকের' ন্যায় আকষর্ণীয় হতে পারে।

তালতলী নদীর রয়েছে বিচিত্র ইতিহাস। তালতলী নদী মূলতঃ কীর্তনখোলা নদীর মরে যাওয়া একটি শাখা। এক সময় ছিল প্রচন্ড খরস্রোত। এ নদী দিয়ে কলকাতার স্টীমার চলাচল করত। রাজারামচন্দ্র এর আমলে মোগল সৈন্যদের সাথে নৌযুদ্ধ হয়েছে এ নদীতে। বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ থেকে মগ-পর্তুগীজদের বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান নৌযুদ্ধের মাধ্যমে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। বরিশালের উত্তারাঞ্চলে গয়ণা চলাচল করত এবং তালতলী বাজার গয়ণার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ১৯৬২ সনে প্রচন্ড এক ঘুর্ণিঝড়ে তালতলী বাজারের পশ্চিম পাশে ঢাকা থেকে বরিশালগামী পাটের ছালা বোঝাই ২টি ফ্লাট ও ২টি খালী ফ্লাট এর সাথে ১টি জাহাজ নদীতে ডুবে যায়। নদীর গভীরতার জন্য জাহাজগুলো তোলা সম্ভব হয়নি। এর কিছুদিন পরই এ এলাকায় চর পরে যায়।

৩০-৩৫ বছর পূর্বে শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের পূর্ব দিক দিয়ে একটি খালে হঠাৎ করে নদীর পানি ঢুকে ব্যাপক স্রোত সৃষ্টি হয় এবং খালটির দু'তীর ভেংগে দু'টি নদীর সংযোগ হয়ে 'ঝুনাহার' নাম ধারণ করে। যার ফলে তালতলী নদীর স্রোত কমে যায় এবং দু'মাথায় নতুন চর জেগে প্রায় ৫ কিলোমিটার নদী ভরাট হয়ে বর্তমানে লেকের রূপ ধারণ করেছে। লেকটির দক্ষিণ পাশের চরবাড়ীয়া ইউনিয়নের পূর্বে লামচরী থেকে পশ্চিমে আমীরগঞ্জ পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ কিলোমিটার ভেড়ীবাঁধ হওয়ায় দু'পাশে প্রচুর বৃক্ষ রয়েছে যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। নদীর উত্তর পারে বিরাট চর রয়েছে যাতে একটি ভেড়ীবাঁধ নির্মান করে বৃক্ষরোপন করে প্রাকৃতিক দৃশ্য আরো মনোরম করা সম্ভব। বিরাট চরে রয়েছে সরকারী খাস জমি-যাতে নির্মান করা সম্ভব দৃষ্টিনন্দন পার্কসহ দর্শণীয় স্থান।

মহান স্বাধীনতার যুদ্ধে বর্বর পাক পাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধের রণাঙ্গান এ নদীটি। এ যুদ্ধে তালতলী নদীর পূর্ব মাথায় ইরানী ও মাজভী নামে ২টি বিরাট স্টীমার ডুবে যায়। বর্তমানে জাহাজ ২টির এলাকায় চর জেগে মাটির নীচে পরে আছে। তালতলী নদীর পাশে বসবাসরত চরবাড়িয়া ঐশ্বর্য ও বীর্যবান দেশ প্রেমিক সাধারণ বাসিন্দারা ২৫ এপ্রিল ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম জীবন দিয়ে রক্ত দিয়ে রেখে গেছে স্বাধীনতার ইতিহাসে গ্রামীণ জনপদের নতুন অবদান। সেই ৪৭ জন শহীদদের "নামের স্মৃতি ফলক" স্থাপন করা হয়েছে তালতলী বাজারে। স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এ তথ্যটি পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে।

তালতলী নদীতে একটি ব্রীজ নির্মানাধীন যার ৭০% কাজ সমাপ্ত হয়ে বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এ ব্রীজের কাজ সমাপ্ত হলে এটি একটি দর্শণীয় স্থান হয়ে যাবে। এ ব্রীজটি এমন স্থানে হয়েছে যার উপর দাড়িঁয়ে সহজেই সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের মনোরম দৃশ্য দেখা সম্ভব ।

তালতলী নদীতে ব্যাপক ভিত্তিতে মৎস্য চাষ প্রকল্প গড়ে তোলা সম্ভব। হতে পারে মৎস্য চাষর অভয়াশ্রম। এ বিষয়ে ইতোপূর্বে এলাকার বাসিন্দা মৎস্য ও পশু পালন মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপ-সচিব জনাব এম.এ শুকুর একটি প্রকল্প নিলেও পরবর্তীতে তিনি অবসর গ্রহণ করায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

চরবাড়িয়া শায়েস্তাবাদ একটি জনপদের নাম সুজলা-সুফলা,শস্য-শ্যামলা বাংলার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাকৃতিক সম্পদ ও সমহিমায় উজ্জ্বল এ দু'টি ইউনিয়নে যুগে যুগে জন্ম নিয়েছে মহান সন্তানেরা তাঁরা রেখে গেছেন তাঁদের শৌর্য-বীর্য ও কীর্তির স্বাক্ষর। বরেণ্য কবি সুফিয়া কামাল, সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা রাজনীতিবিদ ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুর হক এর জন্ম এ শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নেই। শায়েস্তাবাদ নবাব পরিবারের সন্তান বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ডঃ কামাল হোসেন। নবাবদের বাড়ী নদী গর্ভে বিলীন হলেও তাদের স্মৃতি বিজড়িত মসজিদের কিয়দাংশ দিয়ে গড়ে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী শায়েস্তাবাদ বাজার মসজিদ।

প্রবীণ দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক আরজ আলী মাতুব্বরের জন্ম তালতলী নদীর তীরবর্তী লামচরী গ্রামে। "আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরী ও সমাধি" তাঁর স্মৃতি বহন করছে। যা দেশ-বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণীয় ও অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম।

২/১টি স্পীড বোর্ড এবং কয়কটি ইঞ্জিন চালিত ট্রলার থাকলে ভ্রমনকারীরা সহজেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অনন্য লীলাভূমি শায়েস্তাবাদ দ্বীপটি ঘুরে আসতে পারে। এর সাথে উপভোগ করতে পারে ঝুনাহারে ১০/১২টি নদীর সংযোগ স্থান ও অসংখ্যক জেগে ওঠা বৈচিত্রময় চরগুলো। যা-প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। চরে বিভিন্ন পাখীর সমারোহ স্বচক্ষে দেখা যাবে। এছাড়া দেখা যাবে অসংখ্যক জেলেদের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মাছ ধরার দৃশ্য এবং বরিশাল থেকে ছেড়ে যাওয়া বিভিন্ন লঞ্চ, ষ্টীমার, সাম্পান, ট্রলার, কার্গো যাতায়াতের দৃশ্যগুলো। যা- দেখে ভ্রমনপ্রিয় মানুষ মুগ্ধ হতে বাধ্য ।

ধান, নদী, খাল এ তিনে বরিশাল। এরই ঐতিহ্য রক্ষার্থে ৫ কিলোমিটার নিরব নদীকে লেকে পরিণত করা, চারিপাশের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, ব্যাপক মৎস্য চাষ ও অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, শায়েস্তাবাদ চরে ভেড়ীবাঁদ নির্মাণ, মহান মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গান ও শহীদদের স্মৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে পর্যটন উপযোগী করে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তর করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এ পর্যটন কেন্দ্রটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

এছাড়াও স্থানীয় সচেতন জনগণ, উৎসাহী বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, শিল্পপতি, বে-সরকারী সংস্থা ও বিভিন্ন এনজিও কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বাস্তবায়ন কল্পে এগিয়ে আসলে তালতলী নদীকে কেন্দ্র করে একটি পর্যটন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে এবং প্রতি বছর বিপুল পরিমান অর্থ আয় করারও সুযোগ হবে।

* দৈনিক শাহনামা - ৪ ডিসেম্ব ২০০৪ খ্রীঃ

* দৈনিক দাক্ষিণাঞ্চল - ৫ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রীঃ
* দৈনিক সত্য সংবাদ - ১৬ ডিসেম্বর ২০০৪ খ্রীঃ
* দৈনিক সমকাল - ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৫ খ্রীঃ
* দৈনিক বরিশাল বার্তা- ১৯ মার্চ ২০০৬ খ্রীঃ
* দৈনিক নয়া দিগন্ত - ৯ জুন ২০০৭ খ্রীঃ
* দৈনিক ডেসটিনি - ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭ খ্রীঃ

একজন সমাজসেবী ও দানবীর অমৃত লাল দে

গ্রামের নাম পাঁচগাঁও। শরিয়তপুরের নড়িয়া থানার চন্দ্রীপুরের অন্তর্গত পাঁচগাঁও গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামটি নদী ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে যায়। পরবর্তীতে নদীতে চর জেগে উঠলে ঐ চরে সবাই ঘর বাঁধেন। গ্রামটি ছিল খুবই নিচু। বছরের অধিকাংশ সময়ই থাকত জলমগ্ন। বিল পরিবেষ্টিত এলাকার মানুষের আয়ের উৎস ছিল চাষাবাদ, মাছধরা এবং ছাতা সেলাইয়ের কাজ। এলাকাটি ছিল দরিদ্র। বাসিন্দারা ছিল নিরক্ষর।

এ গ্রামে দরিদ্র পরিবারে ১৩ আষাঢ় ১৩৩১বাং/২৭ জুন ১৯২৪ইং সনে বিশিষ্ট সমাজসেবী ও দানবীর অমৃত লাল দে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা রাসমোহন দে। মা সারদা সুন্দরী দে। পিতামহ রাজচন্দ্র দে, পিতামহী যমুনা রানী দে। রাসমোহন দে'র পাঁচপুত্র ও দুই কন্যা। পুত্ররা হলেন অমৃত লাল দে, শান্তিরঞ্জন দে, রাখাল চন্দ্র দে, মনীন্দ্র চন্দ্র দে ও বিজয় কৃষ্ণ দে। দুই কন্যা হলেন রাই রানী মন্ডল ও কাঞ্চন বালা দে। বড় দুই ভাই অল্প বয়সে মারা যান।

তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নদী। নদীতে মাঝির ভাটিয়ালী সুর। চারিদিকে বিল আর বিল। গাছে গাছে পাখির কিচির-মিচির শব্দ। গ্রামটি ছিল ছবির মতো। অমৃতের শৈশব কেটেছে ছায়াসুনিবিড় পাখি ডাকা এ গ্রামেই।

স্বাধীন বাংলাদেশ সেদিন ছিল না। এদেশ তখন ভারতবর্ষের সাথে ছিল। পাকিস্তানও প্রতিষ্ঠা হয়নি তখন। অমৃত লাল দে'র পিতা এবং পিতামহ শীতল পাটি বুননের কাজ করতেন। অমৃত লাল দে'র বাবা, জ্যাঠা ও কাকাদের নিয়ে একান্নবতী সংসার ছিলো। জমি-জমা তেমন ছিল না। ছোট বড় সবাইকে আয় করে সংসার পরিচালনা করতে হতো। উপার্জনের অপেক্ষা সংসারের লোক সংখ্যা বেশী ছিল। তাই সংসারে অভাব লেগেই থাকতো। এই অভাবের সংসারে শিশু অমৃত লাল দে অযত্ন অবহেলা বড় হতে থাকেন।

মা সংসারের কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন। শিশু অমৃতের দেখা-শুনা করার খুব একটা সময় পেতেন না তিনি। তবে তার আগের দুই পুত্র সন্তানের মৃত্যু হওয়ায় অমৃত মায়ের স্নেহ-মায়া ছিল তার প্রতি একটু বেশিই। অন্যদিকে দুই বোনেরও শিশু অমৃত প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল।

অমৃত লাল দে'র সাত বছর বয়সের সময় তার ঠাকুরমা মারা যান। এরপরেই তাদের একান্নবর্তী সংসার ভেঙ্গে যায়। অভাব-অনাটন তখন আরো বেড়ে যায়। সংসার আলাদা হবার কিছুদিন পরে তার বাবা ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়। এ সময় সংসারে উপার্জনের কেহ না থাকায় অভাব অনাটনের মধ্যে সংসার চলতো। দু'বেলা দু'মুঠো খাবারই জুটতো না। অমৃত লাল দে নিজে বলেছেন- 'দু'দিন-তিনদিন অনাহারের পর যখন দু'মুঠো খাবার জুটতো তখন যে কি আনন্দ হত-মনে হত এত সুখ বুঝি পৃথিবীতে আর নেই'। দারিদ্রতার ছোবল যে কত ভয়ঙ্কর তার বাস্তব চিত্রটি কিশোর অমৃত মর্মে মর্মে উপলব্দি করতে পেরেছিলেন।

অভাব-অনাটন, দুঃখ-কষ্ট থাকলেও কারো প্রতি অভিমান ছিল না অমৃতের। খাবার জুটলে সাবাই মিলে মিশে খেত। ভাই-বোনদের মধ্যে ছিল গভীর মমত্ববোধ ও গভীর ভালবাসা। শিশুকাল থেকেই অমৃত ভদ্র, নম্র এবং লাজুক ছিলেন। বাড়ির অন্য সব সচ্ছল আত্মীয়-স্বজনদের নিকট থেকে আর্থিক কোন সাহায্য পাননি। ছোট বেলা অমৃতের মনে প্রশ্নে সৃষ্টি হতো, কেন আমরা গরীব, কেন বাবা গরীব হলেন ? কেন দু'মুঠো খাবরও জুটে না ? অপরদিকে আত্মীয় স্বজন কিছু না কিছু কাজ করে ব্যবসা করে ভালোই আছেন। তাদের বেশ চলে যাচ্ছে। ইচ্ছে হলে তারা একটু সাহায্য করতে পারতেন?

আত্মীয় বিপদে আত্মীয়, স্বজনদের বিপদে স্বজন, মানুষের বিপদে মানুষ এগিয়ে আসবে এমনটাই হওয়া উচিত। কেন তা হয় না ? এ সব প্রশ্ন তাঁর ভেতর ভীষন আঘাত করে। কি করে মানুষ এত নিষ্ঠর হয়, অমৃত তা ভেবে পান না। অমৃতের মধ্যে শিশুকাল থেকেই মানুষের জন্য মমত্ববোধ ও ভালবাসা জন্ম নিয়েছিল। এ থেকেই গরীবদের প্রতি তাঁর অসীম সহানুভুতি ও দুঃখবোধ সৃষ্টি হয়। দুঃখের সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন বলেই দুঃখ-কষ্ট দেখলে তাঁর মন বিচলিত হত। নিজের দুঃখের অনুভূতির দিয়ে অন্যের দুঃখকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই গরীবদের মাঝে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করতে সর্বদা সচেষ্ট হয়েছেন।

ছোট বেলা থেকে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ ছিলো প্রবল। কিন্তু যাদের খাবার জোটেনা তাদের পড়াশুনা চলে কিভাবে। স্কুলে যেতে একটি খাল ছিল। নৌকায় চড়ে স্কুলে যেতে হতো। দ্বিতীয় শ্রেনি থেকে তৃতীয় শ্রেনীতে উঠার পরই তার বাবা ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। তখন স্কুলে বেতন ছিল চার আনা। ঐ চার আনা দেবার মত তার মায়ের সামর্থ ছিল না। নৌকায় পয়সা লাগবে বলে খাল-বিল সাঁতরে স্কুলে যেতেন। কষ্ট হলে অমৃত মনে মনে ভাবত আমি পড়াশুনা করব, বড় হব, মা-বাবার দুঃখ ঘোচাব, ভাইদের লেখাপড়া শেখাব, মানুষের মত মানুষ হতে হবে আমাকে।

পড়া-শুনা করতে না পাড়ায় তার মনের ভেতর বেদনার হাহাকার বৃদ্ধমান ছিল। সহপাঠীরা যখন স্কুলে যেত তখন অমৃত কান্না করতো। মা ছেলেকে সান্তনা দিয়ে বলত, পৃথিবীর কত মানুষ পড়াশুনা না করে বড় হয়েছে। চেষ্টা কর তুমিও একদিন বড় হবে। মায়ের এ আশীবার্দ নিয়ে জীবন যুদ্ধে নেমে ছিলেন। মা-বাবা, ভাই-বোনদের সুখের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য উপার্জন করার মধ্যে ভগবানের আর্শীবাদ খুঁজে তিনি পেয়েছেন।

অর্থাভাবে এবং কোন কাজ না পাওয়ায় বিড়ির কারখানয় কাজ শিখেছেন। এক সময় আকিজ বিড়ির কারখানা ও বাঙ্গালি বিড়ির কারখানায় কাজ করেছেন। ১৩৫০ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে এবং গ্রামে কোন কাজ না থাকায় বাবা ভাইসহ বরিশাল শহরে কাজের সন্ধানে আসেন। বাবা ঘরের টিন বিক্রি করে দিয়ে কিছু টাকা যোগাড় করেন। তা থেকে কিছু টাকা মাকে দিয়ে বাকি টাকা নিয়ে বরিশাল আসেন।

বরিশাল এসে এলাকার দুর সম্পর্কের এক কাকার ঘোল-মুড়ির দোকানে উঠেন। কাকার সহায়তায় স্ব-রোডে সরোজিনী বৈষ্ণবীর বাড়ির একখানা ঘর ভাড়া করে মাসিক পাঁচ টাকা করে এবং ঐ দিন থেকেই সেখানে বসবাস শুরু করেন। পরে দিন কাজের সন্ধানে নেমে পড়েন। কারখানা থেকে কারখানায় ঘুরলেন কিন্তু কোন কাজ জুটলো না। বাবা রাসমোহন বাবু পুরান বাজারে কাঁচা মালের ব্যবসা শুরু করেন। বাবার সাথে পরামর্শ করে বিড়ির পাতা ও তামাক কিনে ঘরে বসে বিড়ি বেঁধে বিক্রি করা শুরু করলেন। এতে যা আয় হত তা দিয়ে তিন জনের চলা সম্ভব হত না, তাই মাকে কোন টাকা-পয়সা পাঠাতে পারতো না। এরই মধ্যে ২ মাস অতিবাহিত হল।

মা'র কাছ থেকে চিঠি পাওয়া গেল, মা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত এবং সংসারে কোন টাকা-পয়সা নেই। সবাই দুঃচিন্তায় পড়ে গেল। বাবা বাড়ী গিয়ে একমাত্র সম্পদ নিজ গৃহখান পঞ্চাশ টাকা বিক্রি করে মাকে নিয়ে বরিশাল আসেন। বাবা-মা ও ভাইদের নিয়ে শুরু হলো বরিশালের সংসার। বহু চেষ্টার পরে কালিবাড়ী রোডে 'জীবন বিড়ি' ফ্যাক্টরিতে কাজে যোগদান করলেন। হাজারে দশ আনা মজুরি চুক্তিতে এতে প্রতিদিন দু'টাকা করে আয় হত। বাবা ও অমৃতের আয়ে সংসার কোন রকম চলতে শুরু হলো।

ছোট ভাই বিজয় কৃষ্ণ দে'র বয়স মাত্র দু'বছর। তখন অমৃতের ছোট চার ভাই একত্রে গুটি বসন্ত আক্রান্ত হলো। সে সময় এ রোগে আক্রান্ত হলে রোগীকে বাড়িতে রাখা যেতো না। পৌরসভার স্বাষ্থ্যকর্মীরা জোর করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিত। অনেক সময় স্বাষ্থ্য কর্মীরা রোগীকে ডালায় বসিয়ে ঘন্টা বাজিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যেত। ঘন্টার শব্দ শুনে মানুষ ভয়ে দূরে সরে যেত। বরিশাল মানুষের তখন বিশ্বাস ছিল, গুটি বসন্তে আক্রান্ত কোন রোগীকে হাসপতালে নিলে সে আর জীবিত ফিরে আসে না। সে সময় এ রোগের উন্নত কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। মা ছোট ভাইদের নিয়ে বসন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ছিল। অমৃতকে কোনো দিন হাসপাতালে যেতে দেওয়া হয় নি। হাসপাতালে দেড় মাস চিকিৎসার পর ভাইয়েরা সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে আসেন। এ সময়ে ছোট ভাইয়েদের আয়ের সুযোগ না থাকায় এবং বাবা বাসায় রান্না করতো বিধায় অমৃতের উপর কাজের চাপ বেড়ে গিয়েছিল। অমৃত দুপুরে বাসায় গিয়ে খেয়ে আসতো এবং রাতে কাজ শেষে মুড়ি ও পানি খেয়ে বিড়ির কারখানায় ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন।

এই চরম বিপদের সময় আত্নীয়-স্বজনদের নিকট চিঠি দিয়ে সাহায্যের অনুরোধ করে ছিলো। কিন্তু টাকা পয়সা দেয়া তো দূরের কথা, চিঠির উত্তরটি দিয়েও সহানুভুতি দেখান নি কেউ। আর এজন্য অমৃত লাল রাগ বা কোন অভিযোগ তুলেন নাই। শুধু ভেবেছেন এটাই সমাজের 'বাস্তবতা'।

অন্ধকার কেটে জীবনে আলো দেখতে পেলেন এ সময় অমৃত লাল দে'র বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। জীবন বিড়ির কারখানার ম্যানেজার বাবু একটি নতুন দোকান খুলে অন্যত্র চলে যাওয়ায় ম্যানেজারের পদটি শূন্য হয়। উক্ত পদে অমৃত লাল দে'র ষাট টাকা বেতনে ম্যানেজারের পদে চাকুরি হয়। ম্যানেজারের দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে অতিরিক্তভাবে বিড়ি বাঁধার কাজ আরো আয় হতো ৫০ থেকে ৬০ টাকা। ফলে সংসারে কিছুটা স্বচ্ছলতা আসে। কিন্তু এ সময় ছোট বোন তার স্বামীকে হারিয়ে তিন সন্তানকে নিয়ে সিলেট থেকে ভাইয়ের আশ্রয় চলে আসেন। এতে সংসারের বোঝা আরো বেড়ে গেল। এদিকে জীবন বিড়ির মালিক অমৃতকে ম্যানেজারের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে একজন নিকট আত্নীয়কে ম্যানেজারের দায়িত্ব প্রদান করেন। আবার অমৃত বিড়ির কারখানায় বিড়ি বাধাঁর কাজ শুরু করলেন।

হাসপাতাল রোডের বর্তমানে 'কারিকর বিড়ির' ফ্যাক্টরি প্রধান কার্যালয়ের স্থলে একটি দোতলা ঘর ছিল। সেখানে পান বিড়ির দোকান করতেন কালাচাঁদ ব্যানার্জী। তিনি পরিবার-পরিবজনসহ ভারতে চলে যাবেন বলে দোকান ঘরটি মাসিক সাত টাকা ভাড়ায় ভাড়া নিলেন অমৃত লাল দে।

কিন্তু দোকান করার মতো অর্থ তাঁর কাছে ছিল না। তাঁর বন্ধু অনন্ত কুমার দাসকে নিয়ে দু'জনের জমানো বারো টাকার পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন।

বিবির পুকুরের পাড়ে খান বাহাদুর হাসেম আলী খান সাহেবের বাড়ীর নিচতলায় পাতা-তামাকের দোকান থেকে দশ টাকার পাতা ও তামাক ক্রয় করেন। অবশিষ্ট দুই টাকা খরচ হয় দোকান ঘর মেরামত করার কাজে। তাঁর ছোট বোন পাতা কেটে দিতেন আর দু'বন্ধু মিলে দিন-রাত বিড়ি বাঁধার কাজ করতেন। খোলা বিড়ির চেয়ে প্যাকেট বিড়ি চাহিদা বেশী ছিল বিধায় প্যাকেট করার চিন্তা করলেন। নিজেরা কারিকর বলে বিড়ির নাম 'কারিকর বিড়ি' রাখার সিদ্ধান্ত করলেন। প্রেস থেকে লেভেল ছাপিয়ে বাজার 'কারিকর বিড়ি' নামে বিড়ি বিক্রয় শুরু করলেন। শহরের সব দোকানেই কারিকর বিড়ি রাখা শুরু করলেন। কয়েকদিনের মধ্যে কারখানায় দশ-বারোজন শ্রমিক বিড়ি বাঁধার কাজ শুরু করেন। তখন আর অমৃত নিজেরা কাজ করতে পারতেন না। দোকানে দোকানে ঘুরে বিড়ি দেয়া এবং সন্ধ্যায় তাগাদা দিয়ে টাকা আদায় করতে সময় চলে যেতে। শুরু হলে কারিকর বিড়ির কাহিনী । বিড়ির চাহিদা বাড়ায় ব্যবসা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। ইতোমধ্যে কারিকর বিড়ির নাম ছড়িয়ে পড়ে শহর থেকে গ্রাম-গ্রামান্তরে। কারখানায় কারিকর বাড়ানো হয় । অমৃত লাল দে'র সততার গুনে প্রতিষ্ঠানের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে ব্যবসায়ী অংশীদার ও ঘনিষ্ট বন্ধু অনন্ত বাবু পরিবার পরিজনসহ কলিকাতায় চলে গিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। এদিকে অমৃতের জন্য বাবা মেয়ে দেখে নির্বাচন করেন। মুন্সিগঞ্জের টুঙ্গিবাড়িয়ার গুয়াপাড়া গ্রামে নবদ্বীপ চন্দ্র মন্ডলের মেয়ে যোগমায়া দে । স্টীমারযোগে গুয়াপাড়া যান এবং কনের বাড়িতে বসেই বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়েতে কোন রকম ধুম দাম হয়নি। ষোল বছরের কিশোরী যোগমায়া দে ফুটফুটে সুন্দরী। বেশ হাসি-খুশি। কখনও মুখে বিসন্নতার ছাপ নেই। বেশ বুদ্ধিমতী এবং খুব অল্প সময়ে সকলের মন জয় করে নিতে পারেন। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সংসারের দায়িত্ব পালন করেন। বৌ হয়ে যেদিন এসেছে সেদিনই রান্না ঘরে গিয়ে সব দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। লক্ষী বলতে যা বুঝায় যোগমায়ার মধ্যে তা বিদ্যমান ছিল ।

সততা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতার কারণে তিনি বিন্দু থেকে সিন্ধুতে পরিণত হয়েছেন। সততা, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, নিষ্ঠা থাকার কারণে তাঁর ব্যবসায় ব্যপ্তি ঘটেছে। তার প্রমান স্বরুপ 'কারিকর বিড়ি', 'অমৃত গুড়া মসলা', অমৃত সরিষার তৈল', অমৃত সূর্যসূখী তৈল', 'কারিকর দাঁতের মাজন', 'অমৃত জর্দা', আজ দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

তার ফ্যাক্টরিতে প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক কাজ করতো। সকল শ্রমিকদেরকে বন্ধুর মত, ভাইয়ের মত করে দেখতেন। শ্রমিকদের দুঃখ কষ্টে সহমর্মিতা প্রকাশ ও সহায়তা হস্ত সব সময় প্রসারিত ছিল। শ্রমিকদের অথবা কোন আত্মীয়-স্বজনদের অসুখে-বিসুখে তিনি উদার হস্তে দান করতেন। কন্যাদায়গ্রস্থ শ্রমিকের তিনি উদ্ধারকতার্র দায়িত্ব পালন করেছেন। কোন শ্রমিকের সাথে কোন অসৌজন্যমূলক আচরণ কোন দিন করেন নাই।

জীবনের কঠিন বাস্তবতা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন সমাজের মানুষের সেবাই হল বড় ধর্ম । তাই সমাজের জন্য, মানুষের জন্য, বিশেষ করে বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি ও খেলাধুলাসহ সামজিক ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য সহযোগিতা অপরিসীম। বরিশাল অঞ্চলে শতাধিক মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারে বিপুল পরিমানের অর্থ সহায়তার দ্বিতীয়জন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

তাঁর সর্বশেষ বৃহৎ দান বরিশাল শহরের কেন্দ্রস্থলে 'অমৃত লাল দে' মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা । এ প্রতিষ্ঠানটি অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষিনাঞ্চলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন এবং তেমনি তাঁর স্মৃতিকে চিরদিন অম্লান করে রাখার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

সমাজ সেবায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শিশু সংগঠন খেলাঘর বরিশাল জেলা কমিটি ১৯৯২ সনে শেরে বাংলা সমাজসেবা পদক প্রদান করেন। ১৯৯৩ সনে খেয়ালী গ্রুপ থিয়েটার তাঁকে রজতজয়ন্ত্রী পদক ও সম্মাননা প্রদান করেন। ১৯৯৯ সনে বাটাজোড় ব্রজমোহন থিয়েটার অশ্বিনী পদক (মরণোত্তর), ২০০০ সনে বরিশাল প্রজন্ম নাট্যকেন্দ্র বিপ্লবী দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ সমাজসেবা পদক (মরণোত্তর) প্রদান করে সম্মানিত করেছে। অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল ধর্মরক্ষিণী সভা, টাউন মমতাজ মজিদুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়, পটুয়াখালী নতুন বাজার আকড়া বাড়ি সেবকবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে অমৃত লাল দে'র সমাজের একজন গুণীজন সংবর্ধিত করেছে।

সফল ব্যবসায়ী, সমাজসেবক, দানবীর অমৃত লাল দে ১৯৯৩ সালের ১৪ জুন, বাংলা ৩০ জৈষ্ঠ্য ১৪০০ সাল রাত বারোটায় কলকাতার পাহাড়পুরের ছোট ভাই শান্তি রঞ্জন দে'র বাড়িতে চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

যুগে যুগে সভ্যতার বিকাশে যেসব মানুষ কর্মগুনে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন, তাদের নিয়মিত জীবন যাপনে অনেক মজার মজার ঘটনা রয়েছে। আমরা তার কতটাই বা জানি। পৃথিবীর বহু বড় বড় মনীষীর প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষা না থাকলেও দীক্ষার গুণে তাঁরা জয় করেছেন দেশ- দেশান্তর। অমৃত লাল দে'র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ ছিল না। শিক্ষা গ্রহনে ব্যর্থ হলেও যে দীক্ষা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাতেই মানুষের জন্য নিজেকে বিকশিত করেছেন। আর সে কারনেই তাকে সমাজসেবী-দানবীর

হিসেবে সকলে স্মরণ করে, সম্মান করেন, শ্রদ্ধা করেন। আমাদের মাঝে অমৃত লাল আজ স্মরণীয় এবং বরণীয়।

অমৃতের অর্থ ছিল না। ছিল- সততা, কাজের প্রতি একাগ্রতা, ছিল দেশ-প্রেম, ছিল ধর্মীয় অনুভূতি। তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় দানবীর হিসেবে খ্যাত। তিনি জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন-শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। তিনি দারিদ্রতার সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্রকে জয় করে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমাদের সমাজে এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত প্রস্থাপন করেছেন।

* 'সাহিত্যের আড্ডা' সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০১৫ এ প্রকাশের জন্য প্রেরিত

চরবাড়ীয়া গণকবর শুভ উদ্ভোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য

জীবন সূর্যের সোনালী প্রভাতে একদিন এ দেশবাসীর ঘুম ভাঙত। আজো ভাঙ্গে। কিন্তু প্রভাত সূর্যের সেই প্রদীপ্ত আলোক আভা যেনো আমাদের মাঝে প্রতিভাত হয়ে ওঠে না। দেদীপ্যমান আলোক রেখায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে না। তবুও মাঝে মাঝে এমন কিছু কিছু চিহ্ন,এমন কিছু কাহিনী-মালা, এমন কিছু ঘটনার বিবর্তন হঠ্যাৎ আলোর ঝলকানীর মতো আমাদের জীরন ধারার সাথে একীভূত হয়ে ওঠে, যাকে মনের অনাবিল বিমূর্ত জীবন-রশ্মির উপরেখায় সর্তস্ফূর্ত ভাবে বিকশিত হয়ে উঠে। তাই তাকে স্বীকৃতি জানাতে হয় মনের মাধুরী মিশিয়ে ।

এমনি এক মুহুর্তে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে ২৫ এপ্রিল'৭১ সনে বর্বর পাকবাহিনী বরিশাল আক্রমনকালে চরবাড়ীয়া দেশ প্রেমিক সর্বস্তরের মানুষ জীবন বিসর্জন ও রক্ত দিয়ে রেখে গেছেন স্বাধীনতা ইতিহাসে গ্রামীন জনপদের নতুন অবদান। চরবাড়ীয়ার ঐশ্বর্য, বীর্জমান শহীদদের আত্মত্যাগের অবহেলিত কবর সংরক্ষনকল্পে আজকে চরবাড়ীয়া গনকবরের শুভ উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি। সভার সম্মানিত প্রধান অতিথি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব শওকত হোসেন হিরন। বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব মোঃ মসিউর রহমান খান, বিশেষ অতিথি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সাবেক থানা কমান্ডার জনাব মোঃ মোকলেছুর রহমান, বিশেষ অতিথি সদর উপজেলার ভাইস-চেয়ান জনাব রেহানা বেগম। উপস্থিত সম্মানিত রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, উপস্থিত শহীদ, আহত ও ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং উপস্থিত বিভিন্ন স্তরের সম্মানীত মুরুব্বী ও যুবকসহ সুধীবৃন্দ। আচ্ছালামু আলাইকুম।

সভার শুরুতেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যার অর্থায়নে আজকের চরবাড়িয়ারবাসীর স্বপ্ন পুরন হলো। অবহেলিত গণকরর সংরক্ষণে বহু লেখালেখি আমি করেছি। তাই আমার খুব আনন্দে লাগছে। চরবাড়ীয়াবাসীর বিশেষ করে শহীদ পরিবারবর্গের তরফ থেকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। জনাব মসিউর রহমান খান শুধু চরবাড়ীয়াবাসীর দোয়া নয়,সাড়া বাংলাদেশ ৩০ লক্ষ শহীদদের পরিবারবর্গের নিকট থেকে দোয়া এবং সম্মানিত হলেন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম লিপিবদ্ধ থাকবে।

একাত্তরের ২৫ এপ্রিল এ দিনটির কথা ভাবতে আমার গায়ের কাটা দিয়ে ওঠে। এমনি প্রতি বছর এপ্রিল মাস আসে আর মনে পড়ে সেই ভয়াল বিভীষিকাময় দিনটির কথা। পাকবাহিনীর বর্বর হামলায় সেদিনের আমি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। সেদিন জীবনটা যেতেও রয়ে গেছে কোন রকমের। এখনও মাঝে মধ্যে বিশ্বাস হয় না। একি সত্যি,স্বপ্ন ,না কোন ঘুমের ঘোরের মধ্যে সে সময়টা কাটিয়েছি।

২৫ মার্চ ৭১ পর হতে ঢাকা হতে মানুষ ছুটে গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে। তালতলী বাজারে হাজারও মানুষের ঢল নামে। মেজর জলিলের নেতুত্বে বরিশাল মুক্তিবাহিনী সংগটিত হয়। ঝুনাহরে ইরানী ও মাভবী স্টীমার নোঙ্গর করে রাখা হয়। বরিশাল পুলিশ লাইন থেকে অস্ত্র এনে সেখানে মুক্তিবাহিনী নিয়োগ করা হয়। মহাবাজ উচ্চ বিদ্যালয় চালু করা হয় মুক্তিবাহীর ক্যাম্প। পাকবাহিনী বরিশাল আক্রমন করবে এ গুজব শুনে এ এলাকায় মানুষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হতে থাকে। প্রতিটি বাড়ী ট্রেন্স খনন করা হয় । ২৫ তারিখ সকাল ১০ টার দিকে নৌপথে তিনটি গানবোট ও কয়েকটি সামরিক সজ্জিত জাহাজ, দুটি বোমারু বিমান ও ২টি হেলিকপ্টারের মাধ্যে ছত্রি সৈন্য অবতরণ করে যৌথভাবে চরবাড়ীয়া আক্রমন করে। এ আক্রমনে ৪৭ জন শহীদ হন, ২৪ জন গুর ্তর আহত হন। ৬৬টি বসতবাড়ী আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। আগুনের লেলিহান শিখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে যা পাশ্ববর্তী জেলা ও উপজেলা থেকে দেখা যায়। ব্যাপক গোলা বর্ষন ও মটারের গুলির শব্দে সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল প্রকম্পিত হয়ে পড়ে। বর্বর বাহিনী বাড়ী বাড়ী গিয়ে যেখানে যাকে পেয়েছে তাকেই নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ৯০ বছরের বৃদ্ধা, মসজিদের ইমামসহ নারী-পুরুষ, শিশু কাউকেই রেহাই দেয়নি। বেনোয়েট দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে হতা করেছে। মতলেব ও শাহজাহান সেনাবাহিনী দেখে দৌড়ে একটি ঘরে ঢুকলে তাদের গুলি করে মেরেই ক্ষান্ত হয়নি। আনন্দ উল-াসের জন্য গৃহখানাতে ধরিয়েছে আগুন। আর

পৈশাচিকতা নিবারণের জন্য জ্বালিয়েছে রক্তাত্ব দেহ দ্!টি। আবদুস সাত্তারের বাড়ীর ট্রেঙ্গের ২ বছরের শিশুসহ মারা যায় ৮জন। আহত হন দু'জন। ৮জনকেই গণকবরে দেয়া হয়েছে। যেটা আজকে উদ্ভোধন করা হলো।

ছেলের সামনে মাকে হত্যা করা হয়েছে। মায়ের কোলে ৮ মাসের শিশু গুলিবিদ্ধ হয়ে কোলেই মারা গেছে। ট্রেঙ্গের মধ্যে গরমে শিশু কান্নাকাটি শুরু করণে মা মুখ চেপে ধরলে সেখানেই শিশুটি মারা গেছে। আবদুল আজিজ লেদা ট্রেঙ্গের মধ্য থেকে মাথা উচু করলেই দুর থেকে গুলি করে তাকে হত্যা করা হয় । সারাটি দিন চরবাড়ীয়া হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে বিধবা মা,স্ত্রী স্বামীকে হারিয়ে আজ নিঃশ্ব ভাবে জীবন কাটাচ্ছে অনেকেই। পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেচেঁ থাকার জন্য কিছু সাহয্যের জন্য ।

মুক্তিযুদ্ধে চরবাড়িয়া জনগণের প্রচুর রক্ত,ধন-জন-জীবন কেড়ে নিয়েছে। এখনো অনেক বীরঙ্গণা করুন কাহিনী স্বাক্ষী লুকিয়ে আছে এ চরবাড়ীয়া।

আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাবেক চীফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল-হ এর সুপারিশে বরিশাল জেলা পরিষদরে সহায়তা তালতলী বাজারে সেই দিনের দূর্বিসহ স্মৃতিকে আকড়ে ধরে দাড়িয়ে আছে ৪৭ জন শহীদদের নামের ফলক। স্বাদীনতার পর পেরিয়ে গেছে ৩৮টি বছর। এই দীর্ঘ সময়ে স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে গালভরা অনেক কথা বলা হলেও বীর শহীদদের পরিবারবর্গের কোন খোজ খবর রাখা হয়নি। স্মৃতি রক্ষার্তে নেয়া হয়নি তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ। ফলে নষ্ট হয়ে গেছে ঝুনাহারের সস্মুখ যুদ্ধের রণাঙ্গলের স্মৃতি। হারিয়ে গেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেক শহীদদের কবর। চরবাড়ীয়া শহীদদের আত্মত্যাগ ক্ষুদ্র করে গন্য করার কোন অবকাশ নেই। সুবিশাল মহিমায় নির্মল ইতিহাসের পাতায় তা স্থান করে নিয়েছে অবলীলায়। আগামী প্রজম্ম তাদের জন্য কি গৌরব বরণডালা সাজিয়ে নিয়ে সশ্রদ্ধায় দাড়িয়ে থাকবে স্মৃতি নামফলক এবং আজকের এ গণকবরের স্মৃতি।

বিগত কয়েক বছরে সরকারের ছত্রছায়ায় জঙ্গী মৌলবাদ,ধমার্ন্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা তার হিংস্র দাঁত-নখ বিস্তার করে সমাজের মানবতাবাদী প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষভাবে বিপর্যপ্ত করে ফেলেছে। সন্ত্রাস, দুণীতি, চাঁদাবাজি, নারী নির্যাতন সমাজকে কুলষিত করে ফেলেছে। ক্ষসতাসীন সরকারের সীমাহীন মিথ্যাচার ও ফ্যাসিবাদী নির্যাতনমুলক কর্মকান্ডে দেশের মানুষ অসম্ভব ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেছিল। মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের পরিবারের প্রত্যাশা বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্য রচিত হোক এক নতুন পৃথিবী। যেখানে মানুষ মানুষকে শোষন করবে না।

দু'তিনটি দাবী রেখে আমার বক্তব্য শেষ করব। দেশে বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রদান করা হয়েছে ও পুনর্বাসন করা হচ্ছে। চরবাড়ীয়া অসহায় শহীদ পরিবারবর্গদের ভাতা প্রদান ও পুর্ণবার্সনের উদ্যোগ নেয়া হলে সত্যিকার অর্থে তারা উপকৃত হতে পারে বলে চরবাড়িয়াবাসীর আজকের দাবী।

মহান মুক্তিযুদ্ধে বরিশালবাসীর গর্ব ঝুনাহারের সস্মুখযুদ্ধের রণাঙ্গণের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি স্মৃতি স্তম্ভ নির্মান করার জোর দাবী জানান গেল ।

মুক্ত মনের চর্চা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এ এলাকায় অধিকতর শিক্ষা বিস্তর, জ্ঞান অর্জন এবং পরিশুদ্ধ জীবন চেতনার সুমহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ৩৭ বছর পর চরবাড়ীয়ায় মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আবদুর রহমান খান স্মৃতি পাঠাগার নামে একটি গণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ পাঠাগার দেশের অজ্ঞতা দুর করার বলিষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। যারা অর্থ খরচ করে সংবাদপত্র কিনতে অক্ষম তারা এ পাঠাগারে এসে সংবাদ এবং প্রয়োজন মত পুস্তক অনায়াসে পাঠ করতে পারবেন। সম্মানিত সুধীবৃন্দের নিকট পাঠাগারের গৃহ নির্মান,আসবাবপত্র ও বই ক্রয়ের সহায়তার দাবী রাখছি।

মহান অতিথিবৃন্ধকে কি দিয়ে বরণ করে নিব সে ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। শহর থেকে বহু কষ্ট করে পল্লীগ্রামে এসেছেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, তাদের কাছে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। সময়, শক্তি ও অর্থ নষ্ট করে এবং শ্রম স্বীকার করে আপনারা আমাদের এ অনুষ্ঠানে যোগদান করে আমাদের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করেছেন। আমাদের করেছেন গৌরবান্বিত, বিশেষ করে প্রধান অতিথি বিশিষ অতিথি, ইউনিয়নের জ্ঞানী, সুধীজন উপস্থিত হওয়ায় অনুষ্ঠানটি হয়েছে গৌরবাজ্জ্বল এবং আপনাদের পদস্পর্শে আমরা ধন্য। ধন্য হয়েছে চরবাড়ীয়াবাসী। আমি আমার নিজের ও চরবাড়িয়া বাসীদের পক্ষ থেকে আপনাদের কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জানাই। দুর দুরন্ত থেকে কস্ট করে এ শহীদদের সভায় যোগদান করে সভাকে অর্থবহ করেছেন। সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানেই শেষ করছে।

খোদা হাফেজ-
বাংলাদেশ দীর্ঘ জীবি হোক।
তারিখঃ

মায়ের প্রতি আরজের ভালোবাসা গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব ৯ এপ্রিল ২০১৬ ও আলোচনা সভায় বক্তব্য উপস্থাপন ।

অমর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'মায়ের প্রতি আরজের ভালোবাসা', 'ঘুম নেই দু'টি আঁখির পাতায়' ও 'ফেরিওয়ালা' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা সভার সম্মানিত সভাপতি। এ মহতি অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর ভিসি জনাব আবদুল মান্নান চৌধুরী। সম্মানিত বিশেষ অতিথি সাবেক সচিব জনাব আবদুল মজিদসহ সকল অতিথিবৃন্দ উপস্থিত সুধীবৃন্দ আচ্ছালামু আলাইকুম। বক্তৃতা দেবার অভ্যাস আমার নাই। তবু অল্প কিছু কথা বলে আমি শেষ করব। মুলতঃ আমি একজন শহীদ পরিবারের সন্তান ও একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা থেকে আমার লেখালেখি শুরু। এযাবৎ আমার ৪ খানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত 'একাত্তরের চরবাড়ীয়া' কাব্যগ্রন্থ 'জীবন থেকে পাওয়া' উপন্যাস 'রূপসার প্রেম' এবং সর্বশেষ গবেষণামূলক গ্রন্থ 'মায়ের প্রতি আরজের ভালোবাসা'। আমি এবং দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর একই ইউনিয়নের বাসিন্দা। ছাত্র জীবন থেকে আমি তাঁর সাথে পরিচিত। তাঁর নির্মিত আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তৃতাটি আমার দ্বারা টাইপ করিয়েছিলেন তার একটি কপি আজও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। ২৫ জানুয়ারী ১৯৮১ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমাদের ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সাথে তাঁর বাড়ীতে আথিত্য গ্রহণের সুযোগ আমার হয়েছিলো। তখন বুঝতে পারিনি মাতুব্বর সাহেব এত বড় মাপের একজন বিজ্ঞান মনস্ক চারণ দার্শনিক। এ মহান দার্শনিক বরিশাল জেলার লামচরি গ্রামে ৩ পৌষ ১৩০৭ বাংলা জন্ম গ্রহন করেন এবং ১ চৈত্র ১৩৯২ বাংলা তারিখ ৮৬ বছর বয়সে বরিশাল শেরে-ই-বংলা মহাবিদ্যালয় মৃত্যুবরণ করে আমাদের মাঝে মৃত্যুঞ্জয় হয়েছে।

অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোতে আনতে যারা পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছেন তাঁরাই আলোকিত মানুষ। আলোকিত মানুষের জীবন দর্শনই আমাদের কাঙ্খিত। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে, চিন্তা ও মননের সমৃদ্ধিতে তাঁদের রয়েছে ব্যাপক ও নিগূঢ় ভূমিকা। যুগে যুগে সভ্যতার বিকাশে যেসব মানুষ কর্মগুনে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন তাদের নিয়মিত জীবন-যাপনে অনেক মজার মজার ঘটনা রয়েছে। আরজ আলী মাতুব্বর স্ব-শিক্ষিত হয়ে দার্শনিক রূপে ইতিহাস গড়েছেন। বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সারাবিশ্বে। আমরা তার কতটাই বা জানি। একজন বিশ্বখ্যাত মানুষের প্রিয় মায়ের মৃত্যুর পর ছবি তোলাকে নিয়ে জীবনে ঘটে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস "মায়ের প্রতি আরজের ভালবাসা"। আমি তাঁর সাথে সাধারণ নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলাম। এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জানা-অজানা কথাকে সংক্ষেপে এ গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটি সব ধরনের পাঠকের কাছে ভাল লাগবে এটা আশা করছি।

মাতুব্বর সাহেব রূপ মোহ, অহঙ্কার মোহ হতে মুক্তি ঘটাতে খুবই ক্ষুদ্র কবিতায় আদর্শ জীবনবোধ জাগাতেও সক্ষম হয়েছেন। তিনি দার্শনিক কবি। তিনি হিতবাণীর কবি ছিলেন। তিনি মঙ্গল কবিও ছিলেন। অনেক বাঁধা আর কুসংস্কারের প্রাচীর পেরিয়ে নিজকে বিকশিত করছেন। সমাজকে দিয়েছেন জ্ঞানার্জনের অনন্য সুযোগ। তাঁর প্রকাশনাগুলো উন্নতমানের এবং অনবধ্য সুন্দর।

আরজ আলী মাতুব্বরের জ্ঞান, মেধা ও প্রজ্ঞা মিশ্রিত লেখনি এদেশের ধর্মান্ধ জনগণের জন্য একটি দিক নির্দেশণা। দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে রচনাগুলো অনুসরণ করলে জীবনের কুসংস্কার দূরীভূত হয়ে জীবন আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত হবে এ প্রত্যাশা করা যায় ।

'লামচরি' গ্রামখানি ছোট; কিন্তু বিজ্ঞান মনস্ক সত্যের সন্ধানী ও মানবতাবাদী আরজ আলী মাতুব্বর অনেক অনেক বড়। মাতুব্বর মৃত্যুর পরে বিগত বছরগুলোতে 'লামচরি' গ্রামখানি বড় হতে হতে শুধু ছাপান্ন হাজার বর্গ মাইলই নয় বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মাইলকে গিলে ফেলেছে। এখন আরজ আলী মাতুব্বরের মতো একজন যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত সত্য ও বিজ্ঞানপ্রেমী মানবাবাদীর বড়ই প্রয়োজন।

জ্ঞান তাপস আরজ আলী মাতুব্বরের দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই, তেমনই নেই লজ্জার পরিসীমা। এই লজ্জা তাঁর জীবনের বিপুল প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে জ্ঞানার্জনের তীব্র পিপাসার জন্য। তিনি আমাদের মনের আকাশে দেদিপ্যমান নক্ষত্র। যার আলোতে আমরা চলি সত্যের সন্ধানে।

তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি সত্যের সন্ধান, আর সৃষ্টির রহস্য। তাঁর সম্পর্কে কিছু বলে শেষ করা সম্ভব নয়, শুধু বলতে চাই; আমাদের এই সমাজে এখন আরজ আলী মাতুব্বরের মত মানুষের বড় প্রয়োজন।

বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানমনস্ক মানবতাবাদী মাটি ও মানুষের দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের জন্য আজ আমরা গর্বিত। তাঁর অধ্যবসায়ী জীবন কাহিনী আমাদের সবার বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকরনীয় বৈশিষ্ট

মন্ডিত। তাঁর স্মৃতিকে আমাদের মাঝে দীপ্তমান রাখার জন্য আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরীটিকে আরজ একাডেমিতে উন্নিতকরণ এবং তাঁর নামে লামচরি অথবা পার্শ্ববর্তী চরাভূমিতে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা এখন সকলের প্রাণের দাবীতে পরিনত হয়েছে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বও এগিয়ে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

পরিশেষে এ আয়োজনের জন্য প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। উপস্থিত সবাইর ভবিষ্যৎ উজ্জল ও দীর্ঘায়ু কামনা করে এখানেই শেষ করছে। খোদা হাফেজ ।

- ৯ এপ্রিল ২০১৬ বাংলাদেশ শিশুকল্যান পরিষদ, ঢাকা।

শহীদ আবদুর রহমান খান ও কিছু কথা

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য জীবন দিয়েছে এদেশের জানা-অজানা অসংখ্য মানুষ। সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে আজ অবহেলিত সে দেশপ্রেমিকদের আত্মহুতির ইতিহাস ধরে রাখতে পারছে না। পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর হামলায় ২৫ এপ্রিল ১৯৭১ সালে চরবাড়িয়া ইউনিয়নের ৪৭ জন আত্মোৎসর্গ করেছেন। তাঁদেরই একজন 'শহীদ আব্দুর রহমান খান'।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান তাঁর নিজ স্বাক্ষরে শহীদ আবদুর রহমান খানের সহ-ধর্মিনী মোসাঃ রাহেলা খাতুনকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা দিয়ে সমবেদনা পত্র প্রেরণ করে দু'হাজার টাকার ক্রসড চেক পাঠিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ / ১৯ মে ২০২০ তারিখ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশ গেজেট ভুক্ত হয়েছে। গেজেট নম্বর ৫৯২৭ ।

আমাদের মুক্তি সংগ্রামে শহীদদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা আমাদের জাতীয় স্বার্থেই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার সুফলকে জনগণের দোর-গোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। তাই মুক্তমনের চর্চা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এ এলাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে "শহীদ আবদুর রহমান খান স্মৃতি পাঠাগার"।

পাঠাগার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শহীদ আবদুর রহমান খান এর সহধর্মিনী মোসাঃ রাহেলা খাতুন ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা (বর্তমান মূল্য) মূল্যের ০.৫ শতাংশ জমি রেজিষ্ট্রীমূলে লাইব্রেরীকে দান করে দিয়েছেন। পারিবারীকভাবে নগদ ০৪ (চার) লক্ষ টাকা এবং বড় একটি গাছ দান করেছেন। শহীদ আবদুর রহমান খান এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরা হলো।

আবদুর রহমান খান বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নের সাপানিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম খান পরিবারে ৭ মার্চ ১৯২৫ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুন্সী আলী আজম খান এবং মাতার নাম লালবরু।

তাঁর পিতা ছিলেন অত্র এলাকায় মেয়াছাব হিসেবে পরিচিত। আরবী শিক্ষায় শিক্ষিত। চরবাড়িয়া বোর্ড স্কুলের একজন আরবী শিক্ষক ছিলেন। এছাড়া এলাকার বিভিন্ন মক্তব পরিচালনা করতেন। তৎকালে পল্লী গ্রামের মানুষ বিভিন্ন রোগে মহামারীতে আক্রান্ত হলে কোন চিকিৎসক পাওয়া যেত না। এ সময় তাদের পাশে থেকে কোরআন হাদিসের আলোকে সুনামের সাথে চিকিৎসা প্রদান করেছেন। তালতলী বাজারে ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত জামে মসজিদে দীর্ঘদিন ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় সবার শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। এ জন্য তাঁকে মুন্সী বলে সবাই সম্মোধন করতেন। তিনিও ১৯৭১ সালে ২৫ এপ্রিল পাকিস্তানী বাহিনীর হামলায় শহীদ হয়েছেন।

মা খুব পরহেজগার ও নামাযী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। পাঁচ ভাই ও ৪ বোনের মধ্যে তিনিই জেষ্ঠ্য সন্তান। পিতার কাছে কোরআন শিক্ষা লাভ করেন। এরপর চরবাড়ীয় বোর্ড স্কুলে স্বনামধন্য মরহুম আরব আলী মাষ্টারের নিকট পড়াশুনা করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে বরিশাল শহরে আলেকান্দা নুরিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। নুরিয়া মাদ্রাসায় অস্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। সংসারে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাড়িতে এসে সংসারের হাল ধরেন এবং কৃষি কাজে সম্পৃক্ত হন।

নিজ বাড়ী সংলগ্ন চরবাড়িয়া গ্রামের প্রখ্যাত পেয়াদা বাড়ির আহম্মদ পেয়াদার বড় ছেলে মৃত আবদুল মজিদ পেয়াদার একমাত্র কন্যা মোসাঃ রাহেলা খাতুনকে বিবাহ করেন। শ্বশুড় জীবিত না থাকায় শ্বাশুড়ীর অনুরোধে সংসার দেখা-শোনা করার জন্য শ্বাশুড়ী স্বরুপজান বিবির সংসারে চলে আসেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যে নিজ আয়ের অর্থ সঞ্চয় করে শ্বশুড় বাড়ির সংলগ্ন জমিতে বাড়ি করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

পেয়াদা বাড়ি মূলতঃ তারা হাওলাদার বংশের লোক। জমিদারের খাজনা আদায় সহায়তা প্রদান করায় এক সময় প্রতাপশালী বাড়িতে পরিনত হয়। তাদের বাড়ির সামনে খাজনা আদায়ের বিরাট (তহশিল) কাছারী ঘর ছিল। সেনেরা এখানে বসে খাজনা আদায় করতো। নিয়মিত খাজনা প্রদান না করলে পাইক-পেয়াদারা তাদের উপর বিভিন্নভাবে অন্যায় অত্যাচার চালাতো। তৎকালে কাছারী ঘরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালত হতো। উক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় মুন্সী আলী আজম খান পরিচালনা করতেন। পেয়াদা বাড়ির লোকজন এক সময় বহু জমি-জমা ও সম্পদের মালিক ছিলেন।

তাঁদের অনেকগুলো ঘোড়া ছিল এবং ঘোড়ার গাড়ীও ছিলো। তালতলী বাজারে (বর্তমানে যেখানে পাকা মসজিদ) ঘোড়ার আস্তাফল ছিলো। তালতলী থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে করে বরিশাল শহরের লোকজন যাতায়াত করতো। শায়েস্তাবাদের জমিদাররা এ ঘোড়া গাড়ীতে চলাচল করতো। ঘোড়ার গাড়ীতে করে ইলিশ মাছ শহরে পৌছানো হতো। এক সময় কলেরা ও গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে পেয়াদা বাড়ির বেশ কয়েকজন লোক মারা যায়। এক সময় প্রাচীন আমলের ঘোড়া গাড়ীর প্রচলন ওঠে যায়। হারিয়ে যায় পেয়াদা বাড়ির সকল ঐতিহ্য। স্বাধীনতার পূর্বেই নদীভাঙ্গনে বাড়িটি আংশিক বিলিন হয়ে যায় ।

১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে প্রচুর খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। এলাকায় ব্যাপক আকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ তরুন বয়সে আবদুর রহমান খান চাউলের ব্যবসা করতেন। কলিকাতা গিয়ে মালামাল এনে এলাকার হাটে হাটে বিক্রি করতেন।

১৯৪৭ সালে বৃটিশদের কাছ থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতার পরে ব্যবসা বাণিজ্য ছেঁড়ে কৃষি কাজে মনোনিবেশ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। পাকিস্তান আমলে দেশে প্রথম ইরি চাষের প্রচলন হলে ইরি চাষের প্রদর্শনী খামার করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । উন্নত জাতের পাঠ চাষ করে তৎকালীন কৃষি অফিস থেকে পুরস্কার লাভ করেছেন। এছাড়াও মিষ্টি আলুসহ বিভিন্ন তরিতরকারি প্রচুর ফলাতেন।

কৃষি কাজের ফাঁকে ফাঁকে শহরে রাখি মালের ব্যবসা চালাতেন। শহরে কন্ট্রাক্টরদের সাথে সাব-কন্ট্রাক্টরের কাজ করেছেন। বারিশাল শহরে সি এন্ড বি অফিসের বিভিন্ন নির্মান কাজে তালতলী বাজারে পাথর এনে শহরে সরবরাহ করে প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন।

আবদুর রহমান খান ছিলেন ধর্মপ্রান, শান্তি প্রিয় এবং ধীর স্বভাবের কম কথা বলার মানুষ। তিনি ২ ছেলে এবং ৪ কন্যার জনক। নিজে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার করানোর কাজটি করতেন। তিনি একজন আদর্শবান, একনিষ্ঠ ও ত্যাগী পরহেজগার ব্যক্তি হিসেবে এলাকাবাসীর মনিকোঠায় স্থান করে নিয়েছিলেন। তাঁর আদর্শকে আমরা সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট থাকব।

আজ আমাদের পাকিস্তানী বলে পরিচয় দিতে হয় না। স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে পরিচয় দেবার গর্বটুকু এনে দেবার জন্য বীর শহীদদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

অপরিসীম শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসায় শহীদ আবদুর রহমান খানকে স্মরণ করছি।

- 'শহীদ আবদুর রহমান খান স্মৃতি পাঠাগারে' দ্বার উম্মোচন সভায় স্মারক পত্রে প্রকাশিত

<u>অতীশ দীপঙ্কর গবেষনা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত স্বর্ণ পদক প্রদান সভায় বক্তব্য উপস্থাপন ।</u>

কথাসাহিত্যিক আবদুল মন্নান

তারিখঃ ০১-০৬-২০১৬ খ্রিঃ

অতীশ দীপাঙ্কর গবেষনা পরিষদ কর্তৃক স্বর্ণ পদক প্রদান অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি। এ মহতি অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি । সম্মানিত বিশেষ অতিথি সকল অতিথিবৃন্দ উপস্থিত সুধীবৃন্দ আচ্ছালামু আলাইকুম। বক্তৃতা দেবার অভ্যাস আমার নাই। মুলতঃ আমি একজন শহীদ পরিবারের সন্তান ও একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা থেকে আমার লেখালেখি শুরু। এযাবৎ আমার ৪ খানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত 'একাত্তরের রক্তাক্ত চরবাড়ীয়া', কাব্যগ্রন্থ 'জীবন থেকে পাওয়া', উপন্যাস 'রূপসার প্রেম' এবং সর্বশেষ মহান দার্শনিক এর জীবনী নিয়ে গবেষনামূলক গ্রন্থ **'মায়ের প্রতি আরজের ভালোবাসা'**। আমি এবং দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর একই ইউনিয়নের বাসিন্দা। ছাত্র জীবন থেকে আমি তাঁর সাথে পরিচিত। তাঁর নির্মিত আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তৃতাটি আমার দ্বারা টাইপ করিয়েছিলেন তার একটি কপি আজও আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। ২৫ জানুয়ারী ১৯৮১ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমাদের ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের সাথে তাঁর বাড়ীতে আথিত্য গ্রহণের সুযোগ আমার হয়েছিলো। তখন বুঝতে পারিনি মাতুব্বর সাহেব এত বড় মাপের একজন বিজ্ঞান মনস্ক চারণ দার্শনিক। এ মহান দার্শনিক বরিশাল জেলার লামচরি গ্রামে ৩ পৌষ ১৩০৭ বাংলা জন্ম গ্রহন করেন এবং ১ চৈত্র ১৩৯২ বাংলা তারিখ ৮৬ বছর বয়সে বরিশাল শেরে-ই-বংলা মহাবিদ্যালয় মৃত্যুবরণ করে আমাদের মাঝে মৃত্যুঞ্জয় হয়েছে।

অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোতে আনতে যারা পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছেন তাঁরাই আলোকিত মানুষ। আলোকিত মানুষের জীবন দর্শনই আমাদের কাঙ্খিত। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে, চিন্তা ও মননের সমৃদ্ধিতে তাঁদের রয়েছে ব্যাপক ও নিগৃঢ় ভূমিকা। যুগে যুগে সভ্যতার বিকাশে যেসব মানুষ কর্মগুনে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন তাদের নিয়মিত জীবন-যাপনে অনেক মজার মজার ঘটনা রয়েছে। আরজ আলী মাতুব্বর স্ব-শিক্ষিত হয়ে দার্শনিক রূপে ইতিহাস গড়েছেন। বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সারাবিশ্বে। আমরা তার কতটাই বা জানি। একজন বিশ্বখ্যাত মানুষের প্রিয় মায়ের মৃত্যুর পর ছবি তোলাকে নিয়ে জীবনে ঘটে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গবেষনামূলক গ্রন্থ **"মায়ের প্রতি আরজের ভালবাসা"**। আমি তাঁর সাথে সাধারণ নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলাম। এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের জানা-অজানা কথাকে সংক্ষেপে এ গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বইটি সব ধরনের পাঠকের কাছে ভাল লাগবে এটা আশা করছি।

মাতুব্বর সাহেব রূপ মোহ, অহঙ্কার মোহ হতে মুক্তি ঘটাতে খুবই ক্ষুদ্র কবিতায় আদর্শ জীবনবোধ জাগাতেও সক্ষম হয়েছেন। তিনি দার্শনিক কবি। তিনি হিতবাণীর কবি ছিলেন। তিনি মঙ্গল কবিও ছিলেন। অনেক বাঁধা আর কুসংস্কারের প্রাচীর পেরিয়ে নিজকে বিকশিত করছেন। সমাজকে দিয়েছেন জ্ঞার্নাজনের অনন্য সুযোগ। তাঁর প্রকাশনাগুলো উন্নতমানের এবং অনবধ্য সুন্দর।

আরজ আলী মাতুব্বরের জ্ঞান, মেধা ও প্রজ্ঞা মিশ্রিত লেখনি এদেশের ধর্মান্ধ জনগণের জন্য একটি দিক নির্দেশণা। দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে রচনাগুলো অনুসরণ করলে জীবনের কুসংস্কার দূরীভূত হয়ে জীবন আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত হবে এ প্রত্যাশা করা যায় ।

'লামচরি' গ্রামখানি ছোট; কিন্তু বিজ্ঞান মনস্ক সত্যের সন্ধানী ও মানবতাবাদী আরজ আলী মাতুব্বর অনেক অনেক বড়। মাতুব্বর মৃত্যুর পরে বিগত বছরগুলোতে 'লামচরি' গ্রামখানি বড় হতে হতে শুধু ছাপান্ন হাজার বর্গ মাইলই নয় বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মাইলকে গিলে ফেলেছে। এখন আরজ আলী মাতুব্বরের মতো একজন যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত সত্য ও বিজ্ঞানপ্রেমী মানবাবাদীর বড়ই প্রয়োজন।

জ্ঞান তাপস আরজ আলী মাতুব্বরের দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের সীমা নেই, তেমনই নেই লজ্জার পরিসীমা। এই লজ্জা তাঁর জীবনের বিপুল প্রতিকুলতার সাথে লড়াই করে জ্ঞানার্জনের তীব্র পিপাসার জন্য। তিনি আমাদের মনের আকাশে দেদিপ্যমান নক্ষত্র। যার আলোতে আমরা চলি সত্যের সন্ধানে।

তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি সত্যের সন্ধান, আর সৃষ্টির রহস্য। তাঁর সম্পর্কে কিছু বলে শেষ করা সম্ভব নয়, শুধু বলতে চাই; আমাদের এই সমাজে এখন আরজ আলী মাতুব্বরের মত মানুষের বড় প্রয়োজন।

বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানমনস্ক মানবতাবাদী মাটি ও মানুষের দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বরের জন্য আজ আমরা গর্বিত। তাঁর অধ্যবসায়ী জীবন কাহিনী আমাদের সবার বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকরনীয় বৈশিষ্ট মন্ডিত। তাঁর স্মৃতিকে আমাদের মাঝে দীপ্তমান রাখার জন্য আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরীটিকে আরজ একাডেমিতে উন্নিতকরণ এবং তাঁর নামে লামচরি অথবা পার্শ্ববর্তী চরাভূমিতে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা এখন সকলের প্রাণের দাবীতে পরিনত হয়েছে। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বও এগিয়ে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

পরিশেষে এ পদক প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। উপস্থিত সবাইর ভবিষ্যৎ উজ্জল ও দীর্ঘায়ু কামনা করে এখানেই শেষ করছে। খোদা হাফেজ ।

***

প্রিয়ার দেয়া ফতুয়া

আদিম মানুষ প্রকৃতি থেকেই তার জীবন যাপনের অনুষঙ্গ খুঁজে নিয়েছিল। প্রকৃতি যেমন মানুষের আত্মরক্ষার হাতিয়ার তুলে দিয়েছিল তেমনি পোষাক শিল্প বিকাশের প্রাথমিক ও উপাদানগুলো মানুষ সংগ্রহ করেছিল প্রকৃতি থেকে। শিল্প রুচি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আদিম মানুষ নিজকে সাজাবার সাধনাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শুরু হয় পোষাকের ডিজাইন। প্রথমে লতা-পাতা, ফুল-পাখির পালক ইত্যাদি দিয়ে তৈরী হতো আদিম মানুষের পোষাক। সভ্যতার অগ্রযাত্রার মানুষের পোষাকের ভাবনাতেও এসেছে বিপুল পরিবর্তন। নিজেকে সাজাতে মানুষ এখন সাহায্য নিচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির।

আবরু রক্ষার পাশাপাশি সৌন্দর্য চর্চার বাঙালির পোষাকের প্রচলন শুরু। পোষাক আর সংস্কৃতির বিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঙালির অঙ্গে উঠে এসেছে বিচিত্র পোষাক। সময়ের চাকাতে বাঙালির সৌন্দর্য প্রীতি বাস্তবতার নিরিখে হলেও সামান্যভাবে বদলে চলছে। পোষাক সাজার চিরন্তন অভিলাষ ছিল বাঙালির সেই মন এখনও বেশ বেঁচে আছে। তবুও পাল্টে গেছে সাজ সজ্জার নানা ব্যাকরণ।

পোষাকের বিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পুরুষের অঙ্গে উঠে এসেছে বিচিত্র পোষাক। তবে পুরানো অনেক কিছুই এখন আবার ফিরে এসেছে। এখন পোষাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়েছে কম দামে সুন্দর পোষাক।

এ দেশের নারী পুরুষ তৈরী পোষাক ব্যবহার করছে পুরণাতীত কাল থেকে। এ কালের আধুনিক শহরের তরুন-তরুনীর দেহে শোভা পাচ্ছে সে কালের বিভিন্ন পোষাক। আজকাল নারী-পুরুষ সবাই ফতুয়া পরার প্রতি দুর্বল হয়ে পরেছে। ফতুয়া পড়ে চলাফেরা একটু স্বাচ্ছন্দ বোধ করছে অনেকেই। তাই অফিস আদালতের কর্মকর্তারাও ফতুয়া পরে অফিস করছে। এমনি একটি পরিস্থিতির ঘটনা কেন্দ্র করে এ গল্পের সূচনা।

পোষাক ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। পোশাক যে একজন ব্যক্তির প্রাথমিক মানদন্ড হিসেবে কাজ করে তা তো বহু যুগ আগে শেখ সাদীই প্রমান করেছেন। জৌলুসহীন পোশাক পরিধান করায়, রাজ দরবারে যথার্থ সন্মান থেকে বঞ্চিত হন তিনি। সেই সন্মান পুনঃরুদ্ধার করতেই কনকশোভিত পোশাক গায়ে জড়িয়ে আবারো রাজ দরবারে পা রাখেন। দামী পোশাকের কারণে এবার বিশেষ খাবার পরিবেশনের ক্ষণ উপস্থিত হতেই খাবার, পাতে তুলে না দিয়ে পকেটে পুরেন। পোশাককে ধন্যবাদ জানানোর জন্যই এমনটি করেছিলেন তিনি। এভাবেই পোশাকের গুরুত্বের কথা প্রমানিত হয়েছে যুগ যুগ ধরে। তাই সময়ের বিবর্তন, পোষাকের অলঙ্কারনে নানা নিরীক্ষা সম্পাদিত হলেও এর আবেদন এক চুলও কমেনি।

জীবন সঙ্গীরা তিন বোন। বিবাহের অল্প দিন পর অফিসের কাজে ভোলা শহরে যেতে হয়। হঠ্যাৎ করে এ অফিসিয়াল প্রোগ্রাম। অফিস থেকে বাসায় গিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু কাপড়-চোপর নিয়ে সোনাডাঙ্গা বাসষ্ট্যান্ডে উপস্থিত। বরিশালের টিকিট নিয়ে রাতের কোচে ভোলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা। সন্ধ্যায় পৌছি যশোর মনিহারের সামনে। যশোর থানার মোড় বড় ভায়রা ভাইয়ের বাসা। কিছু ক্ষনের জন্য যাত্রা বিরতি দিলেও এ সময়ে তাদের বাসায় যাওয়া সম্ভব হলো না।

মনটা ছট ফট করছিল। খুব খারাব লাগছিল। একে তো নতুন বাসা। আবার নতুন জীবনসাথীকে একা রেখে প্রথম বার দুরে যাত্রা। তাই হয়তো মনটা খারাপ। বিভিন্ন চিন্তা করতে করতে ভোরে বরিশাল এসে পৌছি। ক্ষনিকের জন্য হলেও মা ও ভাইবোনদের সাথে দেখা করি। কিছু নাস্তা খেয়ে লঞ্চ ঘাটে এসে ভোলার উদ্দেশ্যে যাত্রা। নদী পথে লঞ্চ ভ্রমন এটাই প্রথম ।

একা একা সময় অতিবাহিত হচ্ছিল না লঞ্চে। একটি দৈনিক সংবাদপত্র ক্রয় করি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে সময় কাটছিল না। কেবল বাসার প্রিয়া মুখ খানি সামনে ভেসে উঠে। নতুন প্রিয়াকে এক বাসায় রেখে দূরের যাত্রা করলে বিষন্ন লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু বিষন্নটা একটু বেশী হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

মনে মনে ভাবি কোথাও কিছু ঘটছে। ভাবতে ভাবতে ব-দ্বীপ ভোলায় গিয়ে পৌছি। সময় তখন সকাল দশটা। লঞ্চ থেকে উঠে একটি রিক্সায় উঠে বসি। যাবার পথেই দেখা হলো আমাদের গ্রামের পরিচিত জাহাঙ্গীরের সাথে। জাহাঙ্গীর উপজেলা নির্বাহী অফিসের ষ্ট্যাফ। অফিসের কাজ শেষ হলে ওদের বাসায় যাব কথা দিয়ে বিদায় নিতে হয়। কাজ সমাধা করে রাতে এসে ওদের বাসায় উঠি।

বহুদিন পর দেখা তাই দেশের বহু কিছু নিয়ে কথা হলো। অনেক রাতে বিছানায় গেলাম ঘুমোতে। দীর্ঘ পথ ভ্রমনে শরীর কড়া হয়েছে। রাতে ঘুম হলো না। সকালে মনটা ফ্রেশ লাগছিল না। পরে দিন আবার বাকী কাজ শেষে ভোলা থেকে লঞ্চে বরিশাল। রাতের কোচে খুলনা পৌছি।

খুলনার বাসায় গিয়ে দেখি বাসা তালা বদ্ধ। তালা খুলে বাসায় ঢুকে সব কিছু এলোমেলো দেখতে পাই। বাসার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তাড়াহুতো করে কোথাও বের হয়েছে। রান্না ঘরে ঢুকে দেখি রান্না করা খাবারও আছে। ঢাকনা উঠিয়ে দেখি মুরগী রান্না করা আছে। মাংশগুলো ফুলে উঠেছে। উপরে একটি সাদা আবারন পড়ে জমাট বেঁধে গেছে। বুঝা গেল হঠ্যাৎ কোথাও গেছে। সাথে সাথে বাড়িওয়ালার কাছে গেলে তিনি বলেন সবাই হঠ্যাৎ যশোর গিয়েছে। সেখানে কোন দুসংবাদ আছে তারা সঠিক কিছু বলেতে পারছে না। বাসার সামনে বড় একটি গাড়ী এসেছিল। তাড়াহুড়ো করে বের হয়ে গেছে। কিছু বলতে পারছে না।

কোন কিছু জানা গেল না। অফিস ঐদিন সরকারী ছুটি। দ্রুত কোন মাধ্যমে জানার সুযোগ হলো না। যশোরের উদ্দেশ্যে সোনাডাংগা এসে আবার বাসে চড়ে বসি। কিন্তু দু'চিন্তায় মাথা ঝিম ঝিম করছে। মনে খুব ভয় হচ্ছে। কোথাও কিছু মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। নিরব হয়ে বসে থাকি। বাহিরে দিকে তাকাতে পারি না। মাথাা ধরে যায়। ক্লান্ত লাগে। সময় যেন কাট ছিল না। মনে হলো বাসটি চলছে না। সব কিছু থেমে থেমে চলছে। হাত পা শীতল হয়ে যায়। আবার মনে হচ্ছে কেউ যেন কিছু বলছে। শুনতে পাচ্ছি না। জানালা দিকে তাঁকিয়ে থাকি। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব ' কবিতার দু'টি পংক্তি। এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মর্ত ছেড়ে , সব চেয়ে পুরাতন কথা ? যেতে নাহি দিব । তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

দুপুরের পূর্বে যশোরের পদ্মভিলা নামক স্থানে পৌছি। বাস থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে মনি আপার বাসায় গিয়ে পৌঁছি। বাড়িতে অনেক লোকের আনাগোনা দেখি। কেউই কিছু বলছে না। এ বাড়ির মেহবান তা অনেকেই বুঝতে পারে নি।

ভেতরে প্রবেশ করার সাথে সাথে সবাই কেঁদে উঠে। সমানেই ছিল শাশুড়ী সে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো। বলল আমাদের সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। আমি ততক্ষণে অবাক হয়ে তাঁকিয়ে থাকি। কিছু বুঝতে পারি না। ইতোমধ্যে শশুর এসে রুমে ঢোকেন। সে বলল মনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

আমি থমকে গেলাম। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কি শুনলাম! এ কি করে সম্ভব? আমার শরীর কাপছিল। আমি নিস্তেজ হয়ে বসে পরলাম। আমাকে আর কিছু জানান হলো না। ভাবতে ছিলাম। মিলাতে পারছিল না, কি হয়ে মারা গেল । এ্যাকসিডেন্ট না রোগে মারা গেল ।

বড় ভায়রার গ্রামের বাড়ি এই প্রথম বার আসা। দোতলায় একটি রুমে আমাকে নেয়া হলো। ওখানে কাপড়-চোপড় পাল্টিয়ে রেস্ট নিতে বলা হলো। শশুর আমার রুমে এসে বিস্তারিত সব কিছু বলতে থাকে। আর দু'চোখের জল মুছতে থাকেন। আমি যে দিন ভোলা রওয়ানা দিয়েছি ঐদিন সন্ধ্যায় পরে যশোর থেকে একটি কোষ্টারে খুলনা বাসার সবাইকে নিয়ে যশোর রওয়ারা হলে, সবাইকে বলা হয়েছিল মনি অসুস্থ্যের কথা। যশোরে সবাই এসে দেখতে পেলো মনি আপার ইহজগতে ত্যাগ করে চলে গেছে। কোস্টার পাঠিয়ে সবাই যশোরে নেয়ার প্রস্তুতি দেখে অনেকেই বুঝতে পেরেছিল।

মনি আপায় সন্ধ্যায় মাগরেবের অজু করতে গিয়ে টিউবওয়ালের পাশে পড়ে যান। সবাই ধরে গাড়ীতে করে হাসপাতালে নেয়ার পথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ডাক্তার বলেছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। আমি ততক্ষনে বুঝতে পারলাম আপায় কিভাবে মারা গেল। আপায় মারা যাবার মুর্হুতেই আমি হয়তো যশোরেই ছিলাম। আমার মনটা তখন খারাপ লাগছিল তাই। দু'দিন মন মানষিক বিব্রত থাকার কারণ এ মৃত্যু দুর্ঘটনাটি ।

যশোর বাংলাদেশের খুব প্রচীন শহর। এ শহরের অনেক ঐতিহ্য রয়েছে। বিশ্ব বানিজ্যের জন্য খ্যাত কলকাতা শহর নিকট হওয়ায় ব্রিটিশ আমল থেকে যশোরে ব্যবসা বানিজ্য প্রসারতা লাভ করে। শহরতলী এলাকাও

বেশ উন্নত। যশোরের এই শহরতলীতে পদ্মভিলা নামক স্থানে ভায়রা ভাইদের বাড়ি। এককালের প্রতাপশালী জমিদারী ছিল তাদের। স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজাকারেরা তাঁর পিতাকে ধরে যশোর নিয়ে যায়। তারপর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

পাকবাহিনী কোথায় কিভাবে মেরে ফেলেছে তা কেউ জানে না। বহু খোঁজা খুঁজি করেও সন্ধ্যান করেও পাওয়া যায় নি। তখন থেকে তাদের সংসার কিছুটা বিষন্নতা বিরাজ করে আসছিল। ....

সংসারে মা জীবিত আছে। ৬ ভাই কোন বোন নেই। প্রচুর জমাজমি আছে। বিরাট এলাকা নিয়ে বসতবাড়ি। বংশীয় চাচাত ভাইয়ের সাথে জমাজমি নিয়ে একটি মনোমানিল্য থাকলেও বাহির থেকে বুঝা মুশকিল ।

বাড়িতে প্রচুর ফলের গাছ রয়েছে। আছে কয়েকটি বড় বড় পুকুর। পুকুরে প্রচুর মাছ। দু'টি পুকুরের ঘাট বাঁধানো, পাকা দোতলা বাড়ি। পুরান চুন শুরকী দিয়ে ইটের গাথুনী। পুরানা প্লাস্টার অনেক জায়গা দিয়ে খসে পড়েছে। বাড়ীর পাশ দিয়ে রেল লাইন চলে গেছে নওয়াপাড়া ও খুলনা । মনোরম দৃশ্য দেখলেই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

সব কিছু জমিদারী কায়দায় হলেও আজ আর তা নেই। সবাই এখন ব্যবসার সাথে জড়িত। পিতা মারা যাবার পর কিছু দিন বাড়ি কবসাবস করে। পরে সবাই যশোর শহরে বসবাস শুরু করে। যশোর শহরে থানার মোড় পুরানা দোতলা একটি বাড়ি। এ বাড়ির অংশ মামারাও আছে। সম্ভবতঃ হিন্দুদের কাছ থেকে যৌথ ভাবে ক্রয় সূত্রে মালিক। মামা যশোর শহরে একজন নামকরা এ্যাডভোকেট। এক পাশে নীচ তলায় থাকেন বড় ভাই দ্বিতীয় তলায় থাকেন অর্থাৎ আমার ভায়রা ভাই। অন্যরা ভাড়াটে বাড়ি বসাবাস করে।

স্বাধীনতার পরবর্তীর ঘটনা। বড় ভাই বিবাহ করেছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে মেঝো ভাইকে বিবাহ করাবেন। মেয়ে দেখা শুরু। বউ সুন্দরী হতে হবে। বহু মেয়ে দেখা হলেও সুন্দরী মেয়ে মনের মত হচ্ছিল না। যশোর ছেড়ে এবার খুলনা এসে মেয়ে দেখা হলো। এবারের মেয়ে খুলনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মসজিদের ইমাম মাওলানা এর জেষ্ঠ্য কন্যা মনি। এবার পাত্রী সবার পছন্দ হলো। পাত্রী পরীর মত সনুদর। যেন চাঁদের টুকরো। যেমন দেখতে তেমনি কথা-বার্তা। তেমনী কাজে কর্মে পারদর্শী। এক এক করে সব কিছু পরখ করা হয়েছে। যেন লক্ষ্মী প্রতিমা। যশোর এর ছেলে হলে কি হবে পাত্রী পক্ষ যশোর মেয়ে দিতে রাজী নন। কিন্তু তাতে কি সৃষ্টি কর্তার উপরে তো কেউর হাত নেই। ছেলের পক্ষের অতি আগ্রহ দেখে এবং বাড়ি ঘর সার্বিক অবস্থা দেখে রাজী হলেন পাত্রীপক্ষ।

স্বল্প সময়ের মধ্যে দিন ক্ষণ দেখে বিবাহ কাজ সমাধা হলো। নতুন বউকে তুলে নেয়া হলো পদ্মভিলা। তাই কিছুদিন পদ্মভিলা বসবাস করে যশোর শহরে থানার মোড় পুরাতন জরার্জীণ বাড়ি তোলা হলো। দোতলা সিঁড়ি সেই আদি কালের। যা দেখলে বুঝা যায় বাড়ি শত বছরের পুরাতন। সুরঙ্গের মতো পথ। দোতলায় মাত্র একটি কক্ষ। সবচেয়ে বিড়ম্বনার কাজ হলো বাথরুমের কাজ সারতে নীচে আসতে হয় । রান্নাবান্নার কাজও চলে নীচে।

ঘরটি সুন্দর করে গোছানো থাকে সর্বদা। ছিম ছাম বাসা। মনি আপা নিজ হাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন। কারো এতটুকু ডাক নেবার সুযোগ নেই। দু'জনের সুখী সংসারে অল্প দিনের মধ্যে ভুমিষ্ট হলেন দুইটি মেয়ে ও একটি ছেলে। ছেলে-মেয়েগুলো মায়ের মত সুন্দর হয়েছে। তাদের দেখলে মন জুড়িয়ে যায়।

তবুও কথা থেকে যায়। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে বউ হয়ে অন্য ঘরে গেলে যা হয়। তা এখানে প্রতিফলিত হয়নি এমন কিছু বলা যায় না। নিরব শোষণ আর অত্যাচার ভোগ করতে হতো। কিন্তু মুখ খুলে বলার ছিল না সন্তানদের এতটুকু সুখের জন্য। বাংলার নারী কেউ এ নিরব শোষণ থেকে মুক্তি পেয়েছে তা বলা যাবে না। ধর্মের বৈষম্য, জাতীয় বৈষম্য,বউ শাশুড়ী দ্বন্দ্ব, তা ছাড়া পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানী, দার্শনিক এমন কি ধর্ম যাজক নারী পক্ষে কথা বললেও পূর্ণ স্বাধীনতা বা অত্যাচারের বিপক্ষে আসন নিতে পারে নি তাঁরা।

বাংলার একজন আদর্শ গৃহিনী হিসাবে জীবন যাপন করতে করতে একদিন তিন সন্তানের মাতা হয়ে যান। এত অল্প বয়সে স্বামী ও ছেলে মেয়ে রেখে জীবনের যবনিকা টানবে, এটা ভাবতে কষ্ট লাগে। ছোট-বড়, শিশু-কিশোর,পাড়া-প্রতিবেশী,আত্মীয়-স্বজন সবার কষ্ট । মাকে চিরতরে হারিয়ে বড় মেয়ে মুনা ভেঙ্গে পড়ে। একা একা থাকে। কম কথা বলে। নিরবে কাঁদে। জানালা দিয়ে বাহিরে তাঁকিয়ে থাকে।

মনি আপার সাথে আমার প্রথম দেখা বিবাহের দিনে খুলনায়। যত দিন দেখা হয়েছে আদর-সোহাগ যা করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। তাঁর মায়ামী কথা-বার্তা ভুলে থাকার নয়। তার সাথে প্রথম দেখাতে আপন করে নেয়ার যাদু খুব কম মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। ছোট হোক আর বড় হোক যার যা পাওনা তার চেয়ে শতগুনে বেশী দিতে কৃপণতা করেন নি কখনো।

দেখা হলেই বলতো কি খাবে ? সুযোগ পেলেই বেড়াতে আসবে। কোন অসুবিধা হলে নিসংকোচে আমাকে বলবে। কোন কিছুতে লজ্জা করবে

না। তা হলে ঠকবে। অল্প সময়ের মধ্যে আপন করেছে ফেলেছে । আমি যেন তার প্রিয় ছোট ভাই। তাই আপার কথা মনে পড়লে চোখে জল এসে যায় ও আবেগে আপ্লুত হতে হয়।

চল্লিশায় বিরাট আয়োজন। দু'টি বড় গরু দুরবর্তী হাট থেকে ক্রয় করে আনা হয়েছে। ভোর রাত্রে গরু জবাই করা হয়েছে। রান্না বান্নার কাজ চলছে। বাড়ীতে বহু মেহনমান। দুরবর্তী আত্মীয়-স্বজন একদিন পূর্বেই এসেছে। বাড়ী ভর্তি হয়েছে। সারাদিন বসে ভোজ পর্ব চলছে। হান্ডি পাতিলের শব্দে ও বাচ্ছা ছেলেদের চলাচলে সমস্ত বাড়ি মুখরিত।

ভোজ পর্ব প্রায় শেষ এমন সময় শোনা গেল ছোট শালি রুমাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করছে বড় দুলাভাই। সকলের মতামত সংগ্রহ চলছে অতি গোপনে। ছোট ছোট তিনটি সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সবাই বিবাহের মতামত ব্যক্ত করছে । কেহ কেহ ভিন্ন মতামতও দিচ্ছে। রুমা এখনো ছোট ওর বিবাহের বয়স হয়নি। আবার কেউ বলছে এ বয়সেও মেয়েদের বিবাহ হচ্ছে । সন্তানের লালন-পালন খালার বিকল্প হয় না।

রুমা দুলাভাইয়ের সংসারে যাক আমি এটা মেনে নিতে পারি নি। কাউকে না বলে বাজারে ঘুরতে এসে বাসে চড়ে খুলনা পৌছি সন্ধ্যার পূর্বে। পরের দিন জানলাম ওখানে শশুর-শাশুড়ী কথা দিয়ে এসেছে। বড় জামাই পুনরায় ছোট জামাইরূপে আত্ম প্রকাশ করছে শীঘ্রই।

প্রিয় শালী কেঁদে কেঁদে বলেছিল আমাকে তার চেয়ে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দিলে ভাল হতো। শুধু কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়তো। কিছুই বলতে পারেনি । শুধু নিয়তিকে নিয়ে ভাবত। আমি রুমার সামনে যেতে পারি নি। কিছুই করার ছিল না। বিবাহ-শাদীর বিষয়ে মুরুব্বীদের রায়ই প্রধান্য দেয়ার রেওয়াজ আমাদের দেশে। 'আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন' প্রবাদটি বলে কিছু শান্তনা দেয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র।

শশুড় ও শাশুড়ী কয়েকদিন পরে যশোর গিয়ে বিবাহের কাজটি সমাধা করে ভুরি ভোজ করে এসেছে। নাতীদের চিন্তায়ও তারা বিচলিত হয়ে পড়তো। ওদের কি হবে। এত ছোট বয়সে মা না থাকলে সন্তানের মানুষ হতে বহু কষ্ট। একথাগুলো বলতো আর শাশুরী দু'চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দিতেন। যাকেই সামনে পেতেন তাকে বলতেন নামাজ পড়ে যেন ওদের জন্য একটু দোয়া করেন।

বড় আপার প্রথম সন্তান মুনা মায়ের খুব ভক্ত। ছোট বেলায় নানী বাড়িতে বেড়াতে আসলে মেজো খালার সাথে বেশী কাটাত। মেজো খালাও ওকে বেশী আদর-যত্ন করতো। কাছে কাছে রাখতো। গোসল করাতো। নিজ হাতে খাওয়াতো। ঘুম পড়াতো। গল্প শুনাতো। মা মারা যাবার পর মেজো খালার মাঝে মাকে যেন তাই খুঁজে পায়। মেজো খালার বাসা খুলনার বানরগাতী। খালার বাসায় প্রায়ই বেড়াতে আসতো। মুনা এখন থেকে খালার বাসায় থাকে।

ইতোমধ্যেই মুনা অনেকটা বড় হয়েছে। মায়ের রূপে ওকে জড়িয়ে ধরেছে। মুনাকে নিয়ে খালা মার্কেটে গেলে বিভিন্ন দিক থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসতে শুরু করে। নিউ মার্কেট থেকে আসার সময় দেখা যায় রিকসা ফলো করে বাসা পর্যন্ত এসে দেখে যাচ্ছে পাত্র পক্ষ। পাত্রপক্ষ পরে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাচ্ছে।

যশোরে দাদী ও কাকারা ফুলতলার এক ব্যবসাযী পাত্র নির্বাচন করে। রুবেলের পারিবারিক অবস্থা ভাল। নওয়াপাড়ার প্রতিষ্ঠিত একজন ব্যবসায়ী। ভাইয়েরাও ব্যবসায়ী। রুবেল কালো ও মোটা হলেও দেখতে বেশ ভাল। ছিমা ছাম পাত্র। সর্বদা হাসি খুশী থাকে। চলাফেরা ও ব্যহারের মধ্যে একটা স্মার্ট নেছ দেখা যায়। রুবেল নিউ মার্কেটে এসে মুনাকে দেখে যায়। তখন সাথে ছিল মুনার মেজো খালা।

রুবেলকে কেউ পছন্দ করে কেউ আবার করে না। এভাবে পছন্দ অপছন্দের মাঝে কেটে যায় একটি বছর। অভিভাবকদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মুনা বিবাহের পিঁড়িতে পা দিয়ে চলে আসে ফুলতলাা শশুর বাড়ি। শশুর-শাশুড়ী কেউ বেঁচে নেই। তারা তিন ভাই। বড় ভাই পূর্বেই বিবাহ করেছে। মেজো ভাই ও ছোট ভাই রুবেল একই সাথে বিয়ে করেছে। একই দিন বউ তুলে ঘরে এনেছে।

ফুলতলা স্বামীর বাড়ি মুনার দাম্পত্য জীবন ভালই অতিবাহিত হচ্ছে । কোন ঝামেলা নেই। কাজের লোকেরাই করে দিচ্ছে সব কিছু। মুনা স্বামী সেবায় সর্বদা ব্যস্ত থাকে। ধণার্ঢ্য স্বামী সকালে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নওয়াপাড়া যায় আর ফিরে রাতে। তবু যে সময়টুকু পায় স্বামীকে সময় দেয়। কিছু দিনের মধ্যে কন্যা সন্তান আসে কোল জুঁড়ে। মুনার শারিরীক কিছু জটিল রোগ দেখা দেয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারত যান। সে সুয়োগে আগ্রার তাজমহল সহ বেশ কিছু ঐতিহাসিক দর্শণীয় স্থান ভ্রমন করে আসে। মেয়েকে ইংলিশ স্কুলে পড়ানোর জন্য খুলনা বিভাগীয় শহরের নতুন বাসায় ওঠে।

ব্যবসায় প্রচুর লাভ হলেই মুনাকে টাকা দিয়ে জামাই কেনাকাটা করতে বলে। মুনা খালাকে নিয়ে খুলনায় প্রচুর কেনাকাটা করে। সুযোগ সবাইকে উপহার হিসেবে জামা-কাপড় কিনে দেয়।

খালু একজন সরকারি চাকুরে। বেশ কিছু দিন হয়েছে বরিশাল বদলি হয়ে আসে। পরিবারের সবাই এখানেই বসবাস করে। খালা প্রায়ই খুলনা যায়। মুনার বাসার খোঁজ খবর রাখেন। নিউমার্কেট থেকে একটি ফতুয়া এনে খালাকে দিয়ে বলে এটা খালুকে দিও। খালা ফতুয়াটি যত্ন সহকারে নিয়ে আসে। আসার পথে ভাবতে থাকে মুনা ওর খালুকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসে। একটি সুন্দর দিনে এটা ওর খালুকে পরিয়ে দেব। এমনিতেই একটু খুঁত খুঁতে। পরের দেয়া কোন উপহার সহজে গ্রহণ করতে রাজী হয় না। বরিশাল এসে কার্টন খুলে দেখে একটি বড় মাপের ফতুয়া। তাই বহু দিন ঘরে পড়ে থাকে। একদিন দর্জির কাছে গিয়ে ফিট করিয়ে নিয়ে আসে। ভালো করে ধুঁয়ে নিজ হাতে আয়রন করে যত্ন সহকারে তুলে রেখে দেয় ।

টিভির সংবাদে জানা গেল আজ বিশ্ব বন্ধু দিবস। এটাই মোক্ষম সময়। তাই এ দিনে ফতুয়াটি পরিয়ে দেবার যথাযথ সময়। খালা যত্নে রাখা ফতুয়াটি বাহির করে খালুকে পরিয়ে দেয়। আর বলে আজ হলো বিশ্ব বন্ধু দিবস। সে-ই তো বন্ধু যে থাকে পাশে। এ কথা চিন্তা করতে করতে খালু নতুন ফতুয়াটি পরে অফিসে চলে যায়।

দিনবদলের সাথে সাথে বদলে গেছে ভালবাসার প্রকাশ ভঙ্গিমা। যুগের পরিবর্তনে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। এসেছে বৈচিত্র্যতা। ভালবাসার কথা এখন শুধু নীল খামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। লাল গোলাপের সাথেও ঘটেছে রকমারী গিফট আইটেমের সংমিশ্রণ। সেই সংমিশ্রণের বর্ণালী রঙ যেন ছড়িয়ে যায় বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবসে। প্রিয়জনকে নিয়ে এ দিবসটিকে ঘিরে বিভোর থাকে মন। বিশ্বজুড়ে বন্ধুত্ব দিবসে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে অন্যরকম এক অনুভূতির উদ্দিপনা।

বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস একেটি সাংস্কৃতিক কৃষ্টি ও আনন্দ ঘন দিবস হিসাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উৎযাপিত হয়ে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ১৯৩৫ সালে আগষ্ট মাসে প্রথম রবিবারকে বন্ধুত্ব দিবস হিসেবে ঘোষনা দেয়। অবশ্য এখন অনেকে ফেব্রুয়ারী মাসকে বন্ধুত্ব মাস এবং ফেব্রুয়ারী ১৮-২৪, এ সাত দিনকে বন্ধুত্বের সপ্তাহ হিসেবে পালন করে থাকে।

বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবসে আমাদের ভাবনা হবে মানুষ মানুষের বন্ধু হবে। আনন্দ ঘন মুহূর্তে তার অংশীদার হবে। দুঃখের দিনে কাছে থেকে সাহায্য করবে। হিংসা, বিদ্বেষ ও দুর্বৃত্তায়ন থেকে নিবৃত্ত থেকে বন্ধুত্বের বাতায়নের মাঝে সুন্দর পৃথিবী গড়বে। বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস বার বার আসবে। মানুষ মানুষের জন্য, মানুষ সকল প্রাণীর জন্য, বন্ধুত্বের হাত বাড়াবে, এ হবে বিশ্ব বন্ধত্ব দিবসের অঙ্গীকার।

সঠিক বন্ধু কে বা কারা। কিভাবে তাকে নির্বাচন করা যাবে এ নিয়ে অনেক মতবাদ রয়েছে। একটি সংস্কৃত শ্লোকে সঠিক বন্ধুর পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে, 'দুর্ভিক্ষে,রাষ্ট্র বিপ্লবে,রাজার দুয়ারে ও শশ্মানে যে তোমার পাশে থাকবে সেই প্রকৃত বন্ধু'। যে আমার আগে হাটে অথবা যে আমার পিছু চলে সে আমার বন্ধু নয়। সেই আমার বন্ধু যে আমার পাশে পাশে চলে ।

বন্ধুর সংজ্ঞা আমরা অনেকেই কম বেশী জানি। বন্ধু কে ? এমন প্রশ্ন মহামান্য বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক এরিষ্টটল নিজেই করেছিলেন নিজেকে এবং নিজেই এই প্রশ্নের উভয় উত্তর দেন এভাবে ÒWhat is a friend ? A single soul which dwells in two bodies." অর্থ্যাৎ "বন্ধু কি? একটি স্বতন্ত্র আত্মা যেটি বাস করে দু'টি প্রাণীর শরীরে।"

সমাজে বসবাস করতে আমাদের ভাল বন্ধু প্রয়োজন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্ধুদের নিয়েছিলেন অত্যন্ত আপন করে। তাঁর একটি উক্তিতে এমনটির প্রমান মেলে। সেটি হচ্ছে-গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের মানুষ। অর্থাৎ বন্ধু সেই যে কারোর ক্ষতি করে না। সে অপরেরর উপকার করে। আপন করে নেয়,ভালবাসা দেয়। তাঁকে কি করে দশজনের সাথে এক করে দেখা যায় ? খ্যাতিমান লেখক ডা. লুৎফর রহমান বন্ধু মানুষটিকে মহান রূপে দেখতে চেয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন- বন্ধুকে বন্ধু ভাবেই মনে করবে, তাকে বিশ্বাস করবে,আর কোন বিচার করবে না। জগতে প্রকৃত বন্ধু একান্ত দুর্লভ।

বিভিন্ন প্রবাদে বন্ধুকে সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী করে নিতে বলেছে সব জায়গাতেই। প্রবাদে বলা হয়েছে বন্ধু পাওয়া ভাল ব্যাপার,এমনকি নরকেও যদি তাঁকে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে সব থেকে উপকারী বন্ধু হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা। যিনি প্রতিনিয়ত আমাদের সেবা করে যাচ্ছেন অদৃশ্য হাত দিয়ে। 'মা' আমাদের যে কোন বিপদ-আপদে শৈশবের কষ্টকর দিনগুলোর সাথে থাকেন এবং দুঃখের দিনগুলোতে কিছু করতে না পারলেও কেঁদে কেঁদে দু'চোখের পানিতে বুক ভাসান। তাই মা হচ্ছে সেই বন্ধু যাকে বিশ্বাস করা ও বিচার না করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। আর্ন্তজাতিক বন্ধুত্ব দিবসের তাৎপর্য শুধুমাত্র সেই সব বন্ধুদের জন্য যারা বন্ধু হতে চায়, বন্ধু হয়ে শত্রুতে পরিণত হতে চায় না। বরং বন্ধুদের প্রাপ্ত মর্যাদা ও ভালবাসা দিতে চায় তাদের জন্যই।

আমরা বন্ধু রূপে বাবাকেও পাই। তিনি অনেক কিছুই আমাদের কল্যাণের জন্য করে থাকেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের ভালর জন্যই। আমাদের অনেক বিপদকে সহজ ও সমস্যাকে সমাধান করতে আমাদের এই উৎকৃষ্ট বন্ধুটি সব সময় চেষ্টা করেন। শিক্ষক আমাদের এমন বন্ধু যিনি আমাদের জ্ঞান বিতরণ করেন। ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা তৈরী করে দেন। সৃষ্টিকর্তা, মা, বাবার পরে শিক্ষকের মত সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু বই। তবে সেই সব বই যে সব বই জ্ঞান দিতে আমাদের সাহায্য করে। মনীষী চার্লস এই বন্ধু সম্পর্কে বলেছেন-বইয়ের মতো বন্ধুও পছন্দ করে গ্রহণ করো ।

বন্ধুত্বের পরিধি ও ক্ষেত্র ব্যাপক। ছেলেদের মেয়ে বন্ধু এবং মেয়েদের ছেলে বন্ধু থাকে। তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে ভালবাসা। যার মধ্যে আছে ভিন্ন আবেগ ও অনুভূতি। ভালবাসার পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে অনেক অভিনয় ও লুকোচুরি থাকে। তাই ভালবাসা দিবস আলাদাভাবে ও ভিন্ন অনুভুতি নিয়ে উৎযাপিত হয়। কিন্তু বন্ধু ও বান্ধবীর মধ্যে যে আলাপচারিতা ও মতের বিণিময় তার মূল্যায়ন সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অনেক সময় একজন পুরুষ ব্যক্তি তার আর্থিক ও পারিবারিক সমস্যা নিজের স্ত্রীকে বলেন না। তার বিশিষ্ট ও অন্তরের বন্ধুকে অকপটে বলেন। তার সাহায্য প্রত্যাশা করেন। পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। অনেক মহিলারা স্বামীকে গোপন কথাটি না বলে বান্ধবীকে বলে। তাই অনেকেই মনে করে, যার কমপক্ষে ৫ জন ভাল বন্ধু আছে সে জীবনে কখনো পরাস্ত হয় না। ভাল বন্ধু পাওয়া ঈশ্বরের আর্শীবাদ ।

সঠিক বন্ধুই হচ্ছে সৎ পথের পরিচালক। উন্নতির সোপান,অন্তরের আত্মীয়। আপন ভাই সব সময় বন্ধু হয় না। কিন্তু একজন বন্ধু সর্বদাই একজন ভাই। বন্ধুত্ব হচ্ছে সোনালী সূতো যা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা। বন্ধু ভেবে সৎ উপদেশ দিতে পারলে তবেই সুন্দর বাতাবরণ গড়ে ওঠবে।

সমাজে সৎচিন্তা ও সুস্থ মানসিকতার উন্মেষ ঘটবে। প্রয়োজনে বন্ধুর পাশে থেকে তাকে সাহায্য করতে হবে। নতুন বন্ধুকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে পুরাতন বন্ধুকে অবহেলা করলে চলবে না।

যখন মানুষের ভাল সময় আসে তখন অনেক বন্ধু জুটে যায়। কিন্তু সঠিক বন্ধুকে বুঝতে না পারলে মহাবিপদের সম্মুখীন হতে হয় ।

বন্ধুত্বের উপকারিতা, বন্ধুদের মাধ্যমে নিজেকে বিকাশ করা ও বন্ধুত্বের মাঝে জীবনকে আনন্দ ঘন করার মাঝেই আনন্দ। জাগতিক উৎকর্ষতা উপভোগ করার আমেজই আলাদা । তাই বন্ধুত্বের আদর্শ ও তারই মাঝে মধুর ও উৎফুল্ল মানসিকতাকে বিকাশ করার লক্ষ্যেই প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে 'বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস।'

কেউ এ দিনটিকে ঘিরে গুনছে অপেক্ষার প্রহর। মনের আকাশে আঁকছে প্রিযজনের ছবি। কেউ বা প্রিয়জনের হাতে হাত রেখে কাটাতে চাইছে সারাবেলা। আবার কেউ কেউ স্বপ্নের রাজকন্যা-রাজপুত্রকে মনের কথা বলার অপেক্ষায় পার করছে নির্ঘুম রাত। সেই সাথে মনের মানুষকে মনের মতো একটা উপহার দেয়ার চিন্তা তো আছেই। সেটা যদি ভালবাসার প্রিয়ার নিজ হাতে দেয়া হয় ।

প্রিয়ার দেয়া ফতুয়াটি পরে অফিসে আসলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অফিস কলিক ও কর্মকর্তাগণ ফতুয়াটি দেখে বিভিন্ন মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়। ফতুয়াটি নাকি দেখতে জার্সির মতো হয়েছে। দু'টি রঙ হওয়ায় কেমন জানি দেখতে ইত্যাদি। অফিস প্রধান তার রুমে ডেকে নিয়ে ফতুয়াটির বিষয় মন্তব্য করেন। হাল্‌কা টিপ্পনি কাটেন। মন্তব্যটি সঠিক বলে মনে হচ্ছিল না। তাতে মনে খুব কষ্ট অনুভব হতে থাকে। দীর্ঘ তিরিশ বছর চাকুরিকালে বহু ভাল বা মন্দ নতুন পুরাতন জামা ও ফতুয়া পড়ে অফিসে আসা হয়েছে কিন্তু কোন দিন কেউ কোন মন্তব্য করে নি। আজকে এ বন্ধু দিবসে প্রিয়ার দেয়া ফতুয়াটি কি সত্যি বেমানান। না সবাইর পছন্দ হয়েছে বলে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এ মন্তব্যগুলো করা। ভাবতে ভাবতে বাসায় এসে ফতুয়াটি খুলো রেখে দেই। আর কোন দিন ফতুয়া পড়বো না -। এর রহস্য খুঁজে বের করতে হবে........।

উদ্ভাবণী কার্যক্রম

শিক্ষা ও সংস্কৃতিক লালন ক্ষেত্র শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, জীবনানন্দ দাস, অশ্বিনী কুমার দত্ত, মুকুন্দ দাস, বেগম সুফিয়া কামাল ও আরজ আলী মাতুব্বর এর স্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন জনপদ চন্দ্রদ্বীপের কীর্তনখোলা ও ইহার শাখা তালতলী নদীর তীরে উপশহর রূপে অবস্থিত চরবাড়িয়া সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলার একটি জনপদ। প্রাকৃতিক সম্পদ ও সমহিমায় উজ্জ্বল চরবাড়িয়া যুগে যুগে জন্ম দিয়েছে অনেক কৃতীমান মানব সন্তান। চরবাড়িয়া ঐশ্বর্য বীর্যবান ও দেশ প্রেমিক সাধারণ বাসিন্দারা ২৫ এপ্রিৈ ১৯৭১ স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন বিসর্জন ও রক্তদিয়ে রেখে গেছে স্বাধীনতা ইতিহাসে গ্রামীণ জনপদের নতুন অবদান। মুক্ত মনের চর্চা ও মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এ এলাকার অধিকতর শিক্ষা বিস্তার, জ্ঞান অর্জন এবং পরিশুদ্ধ জীবন চেতনার সুমহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে চরবাড়িয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আবদুর রহমান খান স্মৃতি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন।

এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক, অলাভজনক বেসরকারী সংস্থা। সংস্থাটি হতদরিদ্র, দরিদ্র ও অসহায় দুঃস্থ জনসাধারণের মৌলিক অধিকার ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে আসছে। সংস্থাটি তার উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উপর সবচেয়ে বেশি প্রধান্য দিয়ে আসছে। কারণ আজকের শিশু আগামী দিনের সুষ্ঠু, সুন্দর বাংলাদেশ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার।

০১.Innovation Grants কার্যক্রমের প্রস্তাবনা ঃ স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলতেন-"সোনার বাংলা গড়তে সোনার মানুষ চাই"। সোনার মানুষ গড়ার একমাত্র কৌশল যুগোপযোগী শিক্ষা। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষাই তার মূল ভিত্তি। এ কারণেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করেছিলেন। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বিষয়টি রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় পটপরিবর্তনের কারণে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। সে-ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুততর উন্নয়নে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয়-গমনোপযোগী শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয় ভর্তি এবং ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার সার্বত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-২) এর আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (Special needs) এবং উপজাতি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে উদ্ভাবনী কার্যক্রম/সৃজনশীল কর্মকান্ড সংস্বলিত প্রকল্প প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

০২.প্রকল্প প্রস্তাবনা দাখিল ঃ বরিশাল জেলার সদর উপজেলার স্বেচ্ছাসেবী, সমাজকল্যান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে বহুমুখী কার্যক্রমমূলক সংগঠন "শহীদ আবদুর রহমান খান স্মৃতি পাঠাগার" জুলাই-২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে রেজিষ্ট্রেশন লাভ করে। রেজিষ্ট্রেশন নম্বর বরি-১৩৭১/০৮ তারিখঃ- ২১-৯-২০০৮। প্রতিষ্ঠানটি তার উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার উপর সবচেয়ে বেশি প্রধান্য দিয়ে আসছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-২) এর আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে উদ্ভাবনী অনুদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে হতদরিদ্র ভাসমান জেলেদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে **"ভাসমান জেলেদের শিশু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকল্প" এর Project profile (পি. পি)** ২৬-০২-০৯ ইং তারিখ দাখিল করা হয় ।

০৩.Innovation Grants কার্যক্রমের অনুমোদন লাভ ও বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে চুক্তিনামা স্বাক্ষরঃ দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাব জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারসহ ৫ সদস্য বাছাই কমিটি সরেজমিনে যাচাই করে সুপারিশ সহকারে অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা মহোদয়ের ২২ ফেব্রুয়ারী-২০১০ তারিখের প্রাশিঅ/ওজি/২বিদ্যা-ঢাকা/২০১০ (পিইডিপি-২)/খন্ড ২/২৭২(৪১) নং স্মারকে অনুমোদন লাভ করে। ০৮-০২-২০১০ ইং তারিখ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও শহীদ আবদুর রহমান খান স্মৃতি পাঠাগারের মধ্যে চুক্তিনামা স্বাক্ষর সম্পাদন করা হয় ।

০৪.প্রকল্প মেয়াদ ঃ চুক্তিনামা অনুযায়ী ০৮-০২-২০১০ তারিখ হতে
০৭-০২-২০১১ তারিখ পর্যন্ত

০৫.প্রকল্পের ক্ষেত্রসমূহ ও প্রয়োজনীয়তাঃ

◊ বরিশাল কীর্তনখোলা নদীতে প্রচুর ভাসমান জেলে পরিবার বসবাস করে। এদেরকে আঞ্চলিক ভাষায় 'বেবাইজ্যা' বলে।
◊ এদের সম্বল হল মাত্র ছোট একখানা নৌকা এবং মাছ ধরার সামান্য কিছু জাল ও বড়শী।
◊ এরা বহু যুগ ধরে এমনকি বংশানুক্রমে মাছ ধরার পেশায় নিয়োজিত। বাংলাদেশের মূল জেলে সম্প্রদায় থেকে এরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস করে।
◊ নৌকাই এদের ঠিকানা ঘর-বাড়ি। নদীর তীরের বাজারকে কেন্দ্র করে এরা বসবাস করে।
◊ মহিলা পুরুষ ও শিশু উভয়ই মাছ ধরার কাজ করে থাকে।

◊ ঝুঁকিপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই এদের বেড়ে ওঠা জীবন যাপন।

◊ শিক্ষার আলো থেকে এরা বঞ্চিত। শিক্ষা কি জিনিষ আজো তারা বুঝে না। ০৮.১

◊ নৌকায় এদের ঠিকানা বিধায় আদম শুমারী ও প্রাথমিক শিক্ষার জরিপের আওতায় সাঠিকভাবে আসে না। ০৮.২

◊ প্রাকৃতিক দূর্যোগ কবলিত ও দারিদ্র-পীড়িত অবহেলিত পিছিয়ে পড়া, সুবিধাবঞ্চিত, জেলে পরিবারের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় সম্পৃক্ত করে শিক্ষিত করা একান্ত জরুরী। ০৭.৩

০৬.প্রকল্পের বর্ণনাঃ

০৬.১ বরিশাল জেলার সদর উপজেলার ৬টি ইউনিয়নেই কীর্তনখোলা ও শাখা নদী দ্বারা বেষ্টিত। এ ইউনিয়নগুলোর নদীর তীরের বাজারকে কেন্দ্র করে মূলতঃ দরিদ্র জেলে পরিবারগুলোর বসবাস। ৩টি বাজার সংলগ্ন ৩টি ভাসমান নৌকায় ৩টি ভাসমান বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় । ভাসমান বিদ্যালয় ৩টি হলো ঃ

০১. রসুলপুর ভাসমান বিদ্যালয়

০২. লাহারহাট ভাসমান বিদ্যালয়

০৩. বুখাইনগর ভাসমান বিদ্যালয়

০৬.২ ভাসমান বিদ্যালয় ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাঃ

ক্রমিক নং	বিদ্যালয়ের নাম	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা		
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট
০১.	রসুলপুর ভাসমান বিদ্যালয়	১৫	১৫	৩০
০২.	লাহারহাট ভাসমান বিদ্যালয়	১৭	১৩	৩০
০৩.	বুখাইনগর ভাসমান বিদ্যালয়	১৫	১৫	৩০

০৬.৩ ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধাদী ঃ ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পোষাক সরবরাহ করা হয়েছে । বিনামূল্যে চার্ট, শে-ট, চক, বই, খাতা, পেন্সিল, কলম ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রত্যহ নাস্তা পরিবেশন করা হয়েছে। ভিডিও এর মাধ্যমে মিনা কার্টুনসহ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন খেলার সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে স্যালাইন, কৃমিনাশক ঔষধ, ভিটামিন সরবরাহ করা হয়েছে

০৭. প্রকল্প বাস্তবায়নে অবদানঃ

ভাসমান নৌকায় ১ বছর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

০৭.০১ দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, ঝুকিপূর্ণ শিশুদের শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত এবং স্কুলগামী হতে উৎসাহী করা।

০৭.২ সৃজনশীল বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।

সমাজের মূল স্রোতের সাথে জেলে পরিবারগুলোকে সম্পৃক্ত করার ভূমিকা রাখা।

০৭.৩উদ্ভাবনী পন্থায় শিশু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিশুর সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করছে। প্রকল্প শেষে নদীর তীরবর্তী কাছাকাছি সরকারী ও রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিশুদের ভর্তির ব্যবস্থা করা।

০৮.উদ্বুদ্ধকরণ সভা ঃ

৩টি ভাসমান বিদ্যালয় এলাকায় ৩টি উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৮.০১.রসুলপুর ভাসমান বিদ্যালয় ঃপ্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৭ এপ্রিল ২০১০ তারিখ রসুলপুর ভাসমান বিদ্যালয় এলাকায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা জনাব মুহাম্মদ ইসমাইল হুসায়েন এ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সংসদ সদস্য এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব তালুকদার মুহাম্মদ ইউনুস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এস. এম. ফারুক, উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, বরিশাল বিভাগ,বরিশাল ও শহীদ আবদুর রহমান খান স্মৃতি পাঠাগারের প্রধান উপদেষ্টা জনাব এম.এ. শুকুর,উপ-সচিব(অবঃ)। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বরিশাল সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব আবদুল হক, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত মহিলা কাউন্সিলার জনাব কহিনুর বেগমসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ।

০৮.০২.লাহারহাট ভাসমান বিদ্যালয় ঃ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৪ এপ্রিল ২০১০ ইং তারিখ লাহারহাট ভাসমান বিদ্যালয় এলাকায় উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এস.এম.ফারুক,উপ-পরিচালক,প্রাথমিক শিক্ষা,বরিশাল বিভাগ, বরিশাল। বিশেষ অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন জনাব এ.এইচ.তৌফিক আহমেদ, বিভাগীয় চীফ, ইউনিসেফ, বরিশাল। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মোস্তফা মাসুদ। এলাকার কাছাকাছি সিংহেরকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নরকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা, সমাজসেবকসহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।২২-৯-১০ইং তারিখ **লাহারহাট ভাসমান বিদ্যালয়টি** সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বরিশাল জনাব মোঃ মহিউদ্দিন, জুনিয়র পরামর্শক জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার

জনাব মোস্তফা মাসুদ পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয়টি সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও জেলে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে স্থানীয় লাহারহাট বাজারে উদ্বুদ্ধকরণ এক সভা করেন। প্রকল্পের সুভারভাইজারসহ শহীদ আবদুর রহমান খান স্মৃতি পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। টুঙ্গীবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবুল বাসার সুলতান, সমাজকর্মী জনাব মোঃ নুর“ল ইসলাম খান ও মোঃ মহসীন হাওলাদারসহ বেশ কিছু স্থানীয় জনগন উপস্থিত ছিলেন। স্থলভাগের সন্নিকটে অবস্থিত নরকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সিংহেরকাঠী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এলাকাবাসী প্রকল্প শেষে জেলে পরিবারের শিশুদের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তির ক্ষেত্রে সব ধরণের সহযোগিতা করবেন বলে সবাই আশ্বাষ প্রদান করে।

০৯. প্রকল্প শেষে শিক্ষার্থীদের পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয় ভর্তি ঃ ৩টি ভাসমান বিদ্যালয়ের নিম্নেবর্ণিত শিক্ষার্থীদের ভাসমান বিদ্যালয়ের সন্নিকটে অবস্থিত রেজিঃ বেসরকারী ও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ভর্তি করানো হয়েছে ।

১০.উপসংহার ঃ

দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-২) এর আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (Special needs) এবং উপজাতি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে উদ্ভাবনী কার্যক্রম/সৃজনশীল কর্মকান্ড সম্বলিত প্রকল্প (তৃতীয় পর্যায়) এর অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জেলেদের শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের 'শহীদ আবদুর রহমান খান স্মৃতি পাঠাগার' স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত "ভাসমান জেলেদের শিশু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকল্প"টি সরকার কর্তৃক অনুমোদন লাভ করার সাথে সাথে সকল কার্যক্রম শুরু করে সাফল্যজনক ভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে ।

প্রাথমিক বিদ্যালয় বহির্ভূত নৌকায় বসবাসরত ভাসমান জেলে পরিবারের শিশুদের নৌকায় ভাসমান বিদ্যালয় তৈরী করে পড়াশুনা শেখানো বিষয়টি সংশি-ষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শন কর্মকর্তা, ইউনিসেফ কর্মকর্তাসহ এলাকার সর্বমহলে প্রশংসীত হয়েছে। দরিদ্র জেলে পরিবারের শিশুদের মাঝে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। জেলে পরিবারগুলোর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে প্রকল্প শেষে ভাসমান ৩টি বিদ্যালয়ের ৬০ জন শিক্ষার্থীকে পার্শ্ববর্তী রেজিষ্টার্ড ও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভর্তি করানো হয়েছে।

স্কুল বহির্ভূত অর্থাৎ কখনও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আসেনি এ ধরনের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ভাসমান বিদ্যালয় ১ বছর পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা খুবই স্বল্প সময়। এছাড়া পাঠদান সময় নির্ধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নদীর জোয়ার-ভাটার সাথে মিল করে জেলে পরিবারের সাথে আলোচনা করে শ্রেণী পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে এ ধরণের দরিদ্র জেলে পরিবারের বহু শিশু এখনো প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষতা দূরীকরণে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ ধরণের জেলেদের সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে অন্তর্ভূক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মায়ের প্রতি আরজের ভালোবাসা

আল্লাহপাকের সেরা সৃষ্টি মায়ের মতো আপন কেউ নেই। কেউ কোনদিন হতেও পারে না। ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং বলেছেন, 'মাতৃত্বেই সব মায়া-মমতা ও ভালোবাসার শুর“ এবং শেষ।' ইসলাম মাকেই দিয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান, মহামর্যাদা। আমাদের শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, 'মায়ের পদতলে সন্ড়ানের বেহেশত।'

ভালবাসা কত সুন্দর, কত পবিত্র, কত শক্তিশালী । মানব আত্মার জন্য কত মহাকল্যাণকর। মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যার জন্য জীবনের গতিধারাই সম্পূর্ণ বদলে যায়। প্রেম, ভালোবাসা সেগুলোর মধ্যে শীর্ষে। এমন কি মানুষের জন্ম-মৃত্যুর চেয়েও গুর“ত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ভালবাসা।

ভালবাসাই এক রহস্য নিকেতন। এর নানা মহল, অসংখ্য রং, বিভিন্ন রূপ। বিচিত্র কাহিনী সম্ভারে ভরা অনন্ড় ভলিউমের সুবিশাল বিচিত্র্য এই ভালোবাসা। সাধারণ মানুষ ভালবাসা সম্বন্ধ্যে জানে, জ্ঞানীরা ভালবাসাকে শ্রদ্ধা করে, দেব-দেবীরা ভালবাসাকে স্বার্থক করে। তাইতো ভালবাসা প্রকৃত মূল্যায়ন যে করতে জানে, সে সাধারণ মানুষ নয়, অসাধারণ; সে মানুষ নয়, দেবতুল্য ।

আমরা মাকে জগতের সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দেই। সন্ড়ান হিসেবে মায়ের চরণতলে খুঁজি অমিয় স্বর্গসুখ। 'মা'–সম্ভবত এটি পৃথিবীর সংক্ষিপ্ততম শব্দ। এক অক্ষরের এই শব্দের মাহাত্য বলে বা লিখে শেষ করা যাবে না । এটি হৃদয়ের গভীর অন্ড়রের অন্ড়ঃস্থল থেকে অনুভবের বিষয় মাত্র। সন্ড়ান গর্ভে ধারণ থেকে একটানা ১০ মাস অপরিসীম কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগের পর প্রসব করেন মা। অতঃপর সন্ড়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে এবং মা ডাক

শোনার সুতীব্র কামনা তাকে ভুলিয়ে দেয় দীর্ঘ দিবস-রজনীর কঠিনতম যাতনা। শত কষ্টের সময় সন্ড়ানই তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে আপন। আবার সন্ড়ানও চায় মাকে তার হৃদয়ের মনি কোঠায় ধরে রাখতে।

যুগে যুগে সভ্যতার বিকাশে যেসব মানুষ কর্মগুনে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন, তাদের নিয়মিত জীবন যাপনে অনেক মজার মজার ঘটনা রয়েছে। আমরা তার কতটাই বা জানি। একজন বিখ্যাত মানুষের প্রিয় মায়ের মৃত্যুর পর ছবি তোলাকে নিয়ে জীবনের ঘটে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ ক্ষুদ্র প্রয়াস "মায়ের প্রতি আরজের ভালবাসা"।

সে মানুষটি হলো আমাদেরই পাশের অজপাড়াগাঁয়ের স্ব-শিক্ষিত আরজ আলী মাতুব্বর। তাঁর মা ছিলেন অতিশয় নামাজী-কালামী একজন ধার্মিক রমনী। মায়ের প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালবাসা। মায়ের মৃত্যুকে নিয়ে ধর্মীয় কুসংস্কারের আবদ্ধ হয়ে একনাগারে ২৬ বছর পড়াশুনা করেছেন। মায়ের ভাসাবাসাকে ঘিরে আজ একজন বড় মাপের (জগৎ বিখ্যাত) দার্শনিক হয়ে আমাদের বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আমরা তাঁর জীবন আলেখ্য জেনে নিলে বুঝতে সক্ষম হবো-কে এ আরজ আলী মাতুব্বর ?

বরিশাল শহর থেকে এগারো কিলোমিটার উত্তর পূর্বে চরবাড়িয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত লামচরী গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামটি ছিল খুবই নিচু। বছরের অধিকাংশ সময়ই থাকত জলমগ্ন। তাই এর নামকরণ হয় লামচরী অর্থাৎ নীচু চর। এ গ্রামেই দরিদ্র পরিবারে ৩ পৌষ ১৩০৭বাং/১৭ ডিসেম্বর ১৯০০ইং সনে আরজ আলী মাতুব্বর জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা এন্ড়াজ আলী মাতুব্বর। মা রবেজান বিবি। তাদের তিন পুত্র ও চার কন্যা। মাত্র চার বছর বয়সে তার পিতা মারা যান।

লাখুটিয়ার জমিজার ও পূর্ব বাংলা রেলওয়ের ডি.টি.এস মিঃ পরেশ লাল রায় (ঘুঘু বাবু) ১৩৩৯ সালের ১৬ বৈশাখ লামচরি আসেন। তিনি থাকবেন স্থানীয় রহম আলী মৃধার বাড়িতে। তাকে অর্ভ্যথনার জন্য বিপুল আয়োজন করা হলো। জমিদার যেখানে বসবেন সে বৈঠকখানা সাজানোর দায়িত্ব দেয়া হলো আরজ আলী মাতুব্বরকে। মাতুব্বরের আয়োজনে দেখে খুশি হয়ে তাকে কলিকাতা নিয়ে নিজ খরচে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবেন বলে আশ্বাস দিলেন।

তার আশ্বাষের প্রেক্ষিতে কার্তিক মাসের শেষ দিকে কলকাতায় যাবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। পোষাক পরিচ্ছদ ও বিছানা পত্র সংগ্রহ করলেন। বরিশাল শহরে গিয়ে জমিদার বাবুর কলকাতার আসবার সংবাদ নিতে লাগলেন। একদা জানতে পেলেন জমিদার বাবু ৩০শে কার্তিক কলকাতায় আসবেন।

মাকে কলকাতা যাবার বিষয়টি বুঝিয়ে বললেন। কলকাতা যাবার পূর্বে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একদিন বিদায় ভোজের আয়োজনের সিদ্ধান্ড় হলো।

১৩৩৯ সনের ২৩ কার্তিক সকল বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ করা হলো। যথারীতি বিভিন্ন রকমের খাবারের প্রস্তুতি চলল সারাদিন। অতিথি নাইওরী ও ছেলে পুলের কোলাহলে বাড়ি আনন্দময় হলো। ভোজ পর্ব ছিলো রাতে। রাত দশটা পর্যন্ড় ভোজ পর্ব চলল। বিদায় কালে মেহমানরা অনেকে তাকে দাওয়াত করলেন। ৩০ কার্তিক পর্যন্ড় ঘনিষ্ট আত্মীয় বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়ার কবুল করলেন। স্থির করা হলো ১ অগ্রহায়ন কলকাতায় যাত্রা করবেন। খাওয়া-দাওয়া শেষে সকল কাজ গুছিয়ে মাসহ সকলে ঘুমাতে যান রাত তখন প্রায় এগারটা।

রাত একটার সময় মা'র ডাকে হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। শুনতে পেলেন মা কাতর কণ্ঠে ডাকছেন 'কুডী ও কুডী, আমারে ধর' ।

বাতি জ্বালিয়ে মা'র কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, মা পা মেলে ঈষৎ চিৎভাবে বসে আছেন, হাত দু'খানা পিছন দিকে মাটিতে ঠেশ দেওয়া, মুখ মেলে অতি কষ্ঠে শ্বাস করছেন।

মা আর একবার মৃদু স্বরে বলে-ন "আমারে ধর!" আমি বাচুম না। হামজার মায়রে বোলা। মরণে বড় কষ্ট।

তিনি মায়ের পিছনে বসে তাঁর গ্রীবার নীচে হাত রেখে মাথাটি তুলে ধরলেন। মা নিজেকে তার কোলে এলিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মা'র শ্বাস ও কষ্ট দুই-ই-কুমে এলো। হামজার মা অর্থাৎ

তার চাচীকে ডাকা হল। তিনি এসে দেখলেন যে, মা নীরব নিঃশব্দ। মাত্র দশ মিনিট সময়ের মধ্যে সবশেষ হয়ে গেল। ঘরের ও বাড়ির অন্যান্য সবাই জেগে উঠল। কিন্তু মাকে কেউ দেখতে পেল, কেউ পেল না। শোয়ানো হল মুর্দা রূপে।

আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে মা'র জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা-অনুশোচনার ঝড় বইতে লাগল। ঘনিষ্টরা কাঁদতে লাগল।

কিন্তু তাঁর কান্না এলো না।

কি হচ্ছিল। কি হলো !

ভেবে কোন কুল-কিনারা পেল না।

একেবার মনে হলো তার যেন কেউ নেই।

কিছু নেই, রোগ-শোক, দুঃখ-বেদনা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা তাও নেই।

নিজেও যেন নেই। জ্ঞানোদয় হলে আবার মনে হতে লাগল এ যেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছেন। ঘুম ভেঙ্গে গেলেই আবার সে ঠিক হয়ে যাবে। প্রভাত হলেই মা তাকে 'কুডী' বলে ভাত খেতে ডাকবেন।

আগুন যেমন জ্বলে ওঠতে না পারলে সৃষ্টি হয় ধুয়া। তেমনি তাঁর শোকাগ্নি রোদন রূপে প্রকাশ হতে না পেরে সৃষ্টি হল ধুয়া। এমনি ধূয়ায় মায়ের শিয়রের পাশে বসে রাত কাটালেন।

মা ছিলেন দুঃখ দৈন্যময় শৈশবের বন্ধু। ছোটকালে বাবাকে হারিয়ে মায়ের কোমল স্নেহে আর অপরিসীম মমতায় বড় হয়েছেন। মা অভাবের সংসারে ঘাম ঝড়ানো পরিশ্রম করে খাবার যুগিয়েছেন। কখন খেয়ে না খেয়ে দিনযাপন করেছেন। তার কর্মজীবনে উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। চরম দুর্দশার দিনে স্নেহময়ী মা তাদের ফেলে নিজের সুখের সন্ধানে ছুটে যান নি। গৃহহীন হওয়ার পরও স্বামীর ভিটায় ঘর তুলে, স্বামীর ভিটায় বাতি জ্বালিয়েছেন। বিধবা মা সন্তানের পড়াশুনার জন্য চেষ্টা করেছেন।

মাকে খুব ভালবাসতেন। মায়ের স্মৃতি তাই তাকে ভাবিয়ে তোলে। চিন্তা করলেন- মায়ের স্মৃতি কিভাবে ধরে রাখা যায়। বহু দিন হতে তাঁর একটা আশা ছিল মায়ের একখানা ছবি তুলে ঘরে রাখবেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তা সফল করতে পারেন নি। আজ সে ইচ্ছা পুরণ করার শেষ সময়।

রাত চারটার সময় বাড়ি থেকে যাত্রা করে খুব ভোরে বরিশাল পৌঁছে। সদর রোডের ফটোগ্রাফার মথুর বাবুকে নৌকায় করে বাড়িতে নিয়ে আসেন। তখন সকাল ৮টা বাজে। বাড়িতে এসে দেখেন লোক জনের অভাব নেই। কবর খোঁড়া হচ্ছে।

মায়ের ছবি তোলার জন্য আরজ আলী শহর থেকে ফটোগ্রাফার এনেছে শুনে উপস্থিত সকলের মধ্যে বির্তকের ঝড় ওঠে। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিরা এবং ধর্মীয় নেতারা ছবি তোলার ব্যাপারটি সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেন নি।

তারা বলে-ন- ইসলামে নারী-পুরুষের ছবি তোলা নিষেধ। মৃত নারীর ছবি তোলা তো আরো গর্হিত কাজ। উপস্থিত গ্রামবাসীরদের মধ্যে একদল বলে উঠলেন যে, ফটো তোলা হলে এ মুর্দা তারা দাফন করবেন না।

অপর একদল বলেতে লাগলেন যে, মুর্দার ফটো তোলা বা মুর্দা সম্মন্ধে অন্য কোন নীতি গর্হিত কাজের জন্য কখনো মুর্দা দায়ী হতে পারে না। সেজন্য দায়ী তার ওয়ারিশ। এ জন্য তার ওয়ারিশের শাস্তি হতে পারে। কিন্তু দাফন না করে ফেলে রেখে, শেয়াল কুকুরের ভক্ষ্য করে মুর্দাকে শাস্তি দেয়া উচিৎ নয়।

বরিশাল শহর থেকে বহু কাজ ত্যাগ করে গ্রামে ইঞ্চি দরে ছবি তুলতে মথুর বাবু আসেন নি। গ্রামে আসলে তাঁকে বিশ টাকা দিতেই হবে। ফটো তোলা হোক বা না হোক। চুক্তির টাকা তাকে দিতেই হবে।

তাই আরজ আলী মাতুব্বর মায়ের ছবি তোলেন। ছবি তোলাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় নেতারা ও গ্রামবাসীরা লাশ দাফন না করে আরজ আলীকে গাল-মন্দ করলেন। কতিপয় খাছ মুছুলি-জানাযা না পড়ে লাশ ফেলে বাড়িতে গেলেন।

এ ঘটনা তাঁর মনে ভীষন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। সেই সঙ্গে জন্ম নেয় অনেক প্রশ্ন। মায়ের জানাযা দেয়া কেন হলো না। মায়ের

দোষ কি ? ছবি তোলা যদি হারাম হয় তার দায় ভাগ তো যে ছবি তোলেন বা তোলান। মা কী দোষ করেছে ? এমনি ধরণের অনেকগুলো প্রশ্নে মুখোমুখি হয়ে তিনি উতলা হন।

এক কঠিন সংকটের মুখোমুখি হলেন আরজ আলী মাতুব্বর। মার প্রতি ভালবাসার সঙ্গে প্রবল দ্বন্দ্ব ধর্মীয় বিধানের। আত্মীয়-স্বজনদের সহায়তায় কোন রকম মায়ের দাফর কাফন করলেন। তার মনের সংকট কাটল না। তাঁর এযাবৎ কালের সব বিশ্বাস ধারণার ভিত্তি এমন প্রবল আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হলো।

তিনি ভাবলেন বুঝতে হবে, জানতে হবে, শিখতে হবে- কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা, কোনটি যুক্তির আর কোনটি অন্ধত্বের।

মায়ের দাফন কাজ শেষ করে মায়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সম্বোধন করে বলে-ন-"মা আজীবন তুমি ছিলে ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ সাধিকা। তুমি কখনো নামাজ রোজা 'কাজা' করনি, করনি কখনো তছবিহ তেলাওয়াত ও তাহাজ্জুদ নামাজে গাফিলতি।

আর আজ সেই ধর্মের দোহাই দিয়ে একদল মুছল্লি- তোমাকে করতে চাইল শেয়াল-কুকুরের ভক্ষ্য, তাদের কাছে হলে তুমি তুচ্ছ, অবহেলিত ও বিবর্জিতা, হলে নিন্দা ও ঘৃণার পাত্রী। সমাজের আজ সর্বত্র বিরাজ করছে ধর্মের নামে কুসংস্কার।

তুমি আমায় আর্শীবাদ কর, আমার জীবনের ব্রত হয় যেন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণ অভিযান। "আর সে অভিযান স্বার্থক করে আমি যেন তোমার কাছে আসতে পারি। **আর্শীবাদ কর মোরে মা, আমি রেখে আসতে পারি যেন সেই অভিযানের দামামা।"**

মায়ের প্রতি ভালবাসার সঙ্গে প্রবল দ্বন্দ্ব ধর্মীয় বিধানের। আরজ আলী মাতুব্বর ভাবলেন, বুঝতে হবে, জানতে হবে, শিখতে হবে-কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা, কোনটি যুক্তির আর কোনটি অন্ধত্বের। এ সময় থেকেই সত্যের সন্ধানে তাঁর যাত্রা শুরু।

আরজ আলী মাতুব্বর এই আঘাতে কোনটি সত্য তার অনুসন্ধানে বাহির হন। ধর্মের নামে কুসংষ্কার সত্য, না বিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞান সত্য ? ধর্মীয় এহেন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কি করা যায় সে লক্ষ্যে পুনরায় জ্ঞান চর্চা শুরু করেন।

আনুষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষা না করেও কেবল নিজের প্রচেষ্টায়ও যে একজন মননশীল লেখক ও যুক্তিবাদী দার্শনিক হওয়া যায়, তারই এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন পাড়াগাঁয়ের মানুষ আরজ আলী মাতুব্বর।

****